The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 25-56, ISSN 2306-3920

ঋত্বিক ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩) চলচ্চিত্র: মালো জীবন-বাস্তবতার মহাকাব্যিক নির্মাণ

ড. ফাহমিদা আক্তার*

[**সার-সংক্ষেপ :** ঋত্বিক কুমার ঘটক পরিচালিত *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩) চলচ্চিত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করি, মালো জীবন-বাস্তবতার মহাকাব্যিক নির্মাণ। নির্মাণের প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হবার পরও, নিজ শিল্পকুশলতার গুণে এই চলচ্চিত্র আজও ধ্রুপদী চলচ্চিত্রের চিরকালীন আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম দর্শকের মনে – দেশ ও দেশের সীমানা ছাড়িয়ে। মহাকাব্যের কেন্দ্রে সাধারণত থাকে কোনো বীরোচিত চরিত্র। *তিতাস একটি নদীর নাম*-এ নেই পুরাণ বা ইতিহাস-আশ্রিত কোনো বিখ্যাত চরিত্রের চিত্রায়ণ। এখানে তিতাস নদীর সমান্তরালে এগিয়েছে নিম্নবর্গের মালোদের সমষ্টিগত জীবনপ্রবাহের ভাঙা-গড়া। তাদের আনন্দ-বেদনা, উৎসব, নৈবেদ্য, জন্ম-মৃত্যু, জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই, ঐক্য, ঐক্যের ভাঙন, পরাজয়, ক্ষয়ের ভেতর আবারও নতুন জীবনের সূচনা – ইত্যাদি নানা বিষয় এ চলচ্চিত্রে ঠাঁই পেয়েছে। অন্ত্যজ ও লোকজ জীবনাশ্রিত এই সকল বিষয় *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রে মহাকাব্যের চিরকালীন রূপ প্রাপ্ত হয়েছে ঋত্বিকের চলচ্চিত্রিক মৌলিকত্বের কারণে। এ মৌলকত্ব বাঙালির আবহমান সাংস্কৃতিক চেতনাজাত। বক্ষ্যমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য, এই চলচ্চিত্রের মহাকাব্যিক নির্মাণ ভঙ্গি অন্বেষণ। একই সাথে, ব্রাত্য জীবন কীভাবে মহাকাব্যের প্রচলতি সংজ্ঞা ও স্বরূপকে অগ্রাহ্য করে এ চলচ্চিত্রে প্রাপ্ত হয়েছে মহাকাব্যিক মহিমা – তাও অন্বেষণ করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। সবমিলিয়ে, *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রের বিষয় আর নির্মাণ কৌশলে মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রের ভঙ্গি ও প্রবণতা অনুসন্ধান আর অনুধাবনের প্রচেষ্টায় এগিয়েছে এ প্রবন্ধ।]

ভূমিকা

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩) বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি ধ্রুপদী ও কালজয়ী চলচ্চিত্র। এদেশের এক অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী মালো সম্প্রদায়ের জীবনপ্রবাহ মহাকাব্যিক ভঙ্গিতে চিত্রিত হয়েছে এই চলচ্চিত্রে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের আত্মজীবনীমূলক একই শিরোনামের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এ চলচ্চিত্রে ঋত্বিক ঘটক বিশ্বস্ত থেকেছেন লেখক বর্ণিত ভাটি অঞ্চলের জীবনপ্রবাহ নির্মাণে। আবার একই সাথে, নিজ শিল্প দক্ষতায় তিতাস পারের মালো জীবনের চলচ্চিত্রায়ণে সংযোজন করেছেন মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র ভঙ্গির। যদিও এতে কাহিনির চলনে আছে একধরনের শ্লথ গতি, তবুও তাতে আছে অসংখ্য জীবনের বিস্তৃতি। বিচিত্র ব্রাত্য জীবনের এই বিস্তার কখনও সহজ অথচ গূঢ় সংলাপে, কখনও চাপা তত্ত্ব-কথায় মোড়ানো লোকজ গানের সরল সুর আর

---

* **ড. ফাহমিদা আক্তার :** অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকৃতির নানারূপের নৃত্যছন্দে। দৃশ্য নির্মাণে তিতাস পারের মালোদের গোষ্ঠীজীবনের বাস্তবতা যেমন আছে, তেমনি আছে এই মৎসজীবী সম্প্রদায়ের লৌকিক উৎসব আর পৌরাণিক নানা আদিরূপ (archetype image) নির্মাণের প্রবণতা। মালোদের জীবনযাত্রা, আনন্দ, বেদনা, উৎসব, নৈবেদ্য, জন্ম-মৃত্যু, জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই, তাদের ঐক্য, ঐক্যের ভাঙন, তিতাসের সমান্তরালে তাদের জীবন প্রবাহের ভাঙা-গড়া, ইত্যাদি নানা বিষয় এই চলচ্চিত্রে উজ্জ্বল চিরকালীন মহিমায়। চলচ্চিত্রের শেষে মালো নারী বাসন্তির মৃত্যু আর শুকিয়ে যাওয়া তিতাসের মতো মালো জীবনের যে বিনাশ – তাকেই কিন্তু মুখ্য করেননি ঋত্বিক। এই ক্ষয়ের মাঝেও আমরা দেখি সবুজ ফসল উঁকি দিচ্ছে, মৃত্যুমুখে ঢলে পড়তে পড়তে ঘোলা চোখে বাসন্তী দেখে একটি শিশুর সেই সবুজ ফসলের বুক চিরে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে আনন্দময় ছুটে চলা। আর এই দৃশ্যকল্পের নির্মিতিতে ফুটে ওঠে এই সত্য: সভ্যতার মৃত্যু নেই – জীবনের উত্থান-পতন আর নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও সভ্যতা প্রবহমান। ঋত্বিক ঘটকের কণ্ঠেও এই সত্যের উল্লেখ স্পষ্ট। তিনি বলেন: “Civilization has no death. Only individual man is mortal but humanity is immortal. It only goes on advancing from one stage to another, I've tried to say this in my film. I cannot end in a pessimistic mood, that would be rather professing lies” (Rajadhyaksha and Gangar, 1970: 101). চলচ্চিত্রের পরিসমাপ্তিতে এই আশাজাগানিয়া ইঙ্গিতের মাঝে নিহিত আছে মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্য। কারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য – উভয় দর্শনেই মহাকাব্যের বিয়োগান্তক পরিণতি সমর্থিত নয়। এই প্রবন্ধের মূল অভিপ্রায় *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রে ঋত্বিকের মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রবণতার শিল্পভাবনা অনুসন্ধান।

মহাকাব্যের মতোই এ চলচ্চিত্রে আছে অসংখ্য জীবনের টুকরো টুকরো আখ্যান, যে আখ্যানে চড়াই-উৎরাই থাকলেও তা প্রচলিত চলচ্চিত্রের মতো ত্রি-বিন্দু বিস্তারী ও নাটকীয় নয়। অসংখ্য জীবনের টুকরো টুকরো অথচ পরস্পর সংযুক্ত আখ্যানের পরতে পরতে এই চলচ্চিত্রে আমরা দেখি পুরাণ, লোককথা আর ঐতিহ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমবায়। চলচ্চিত্র নির্মাণ কৌশলেও আমরা দেখি ঋত্বিকের ধ্রুপদী নির্মাণ প্রবণতা। সংলাপে তিনি কখনও রেখেছেন শব্দের আড়ালে দূরাগত কোনো অর্থ নির্দেশের ইঙ্গিত, এনেছেন সংগীতের অতলস্পর্শী ভাব ও ব্যঞ্জনা। চরিত্রগুলোতে দিয়েছেন আবহমান বাংলার নদীপাড়ের মানুষের জীবন প্রবণতার প্রত্নরূপ। এ কারণেই বাসন্তী, রাজার ঝি, অনন্ত, কিশোর, সুবোল, মুংলী, রামপ্রসাদ কিংবা কাদির মিয়া – এরা সবাই যেন আমাদের খুব চেনা। জীবন সংগ্রামে নিরত এই সব মানুষদের চিত্রায়ণে দেখি কখনও একই অভিনেতার দুই চরিত্রে অভিনয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাছাই করেছিলেন ঋত্বিক ঘটক বাংলাদেশ থেকে, যাঁদের ছিল নদীসংলগ্ন মানুষের জীবনযাত্রা দেখার অভিজ্ঞতা। কৃত্রিমতাকে জ্ঞাতসারে এড়িয়েছেন তিনি – স্টুডিও বর্জন করেছেন। পদ্মাতীরবর্তী গ্রামগুলোর প্রকৃত অবয়ব হয়ে উঠেছিল তাঁর চলচ্চিত্রের দৃশ্যকল্প। শ্যুটিং করেছেন কখনও ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কখনও আরিচাঘাট, কখনও পাবনা, নারায়ণগঞ্জ ও বৈদ্যের বাজারে (কায়সার, ২০০১: ২০৯)।

কলকাতার এই বাঙালি পরিচালক, ঋত্বিক ঘটকের শেকড় মূলত এপার বাংলার জলকাদায় প্রোথিত। দেশবিভাগের ফাটল চিহ্নের পোড়া ক্ষত বুকে নিয়ে ঋত্বিক খুঁজে বেড়িয়েছেন ঐতিহ্য আর বাস্তুচ্যুত দলিত মানবের জীবন। তাঁর এই শিল্প অন্বেষণের পথেই সৃজিত হয়েছে *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্র। এতে দেখি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস পাড়ের প্রবহমান জীবন-বাস্তবতার এক মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রায়ণ । ১৯৭৩ সালে নির্মিত এ চলচ্চিত্রে শুধু সংগীত পরিচালক (বাহাদুর হোসেন খান) ছাড়া, অভিনেতা অভিনেত্রী থেকে শুরু করে কলাকুশলী, চিত্রগ্রাহক, সম্পাদক ও যন্ত্রী, সকলে ছিলেন বাংলাদেশি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সদ্য জন্ম নেওয়া বাংলাদেশের অস্থিতিশীল প্রেক্ষাপটে এফ.ডি.সি. (বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন)-এর নড়বড়ে যন্ত্রে *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর

মতো এপিকধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ এক বিস্ময়ের সাক্ষ্য। কম্পোজিশান, ফ্রেমিং, সংগীত ও শব্দ প্রয়োগ, জীবন ঘনিষ্ঠ অভিনয়, বাস্তব দৃশ্য নির্মাণ, আবার বাস্তব-ঊর্ধ্ব বিভিন্ন রূপকল্প নির্মাণ – চলচ্চিত্রায়ণের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ঋত্বিক যেন আপোশহীন ছিলেন।

তিতাস একটি নদীর নাম চলচ্চিত্রের বিশেষ পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা

স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় ৫০ বছর অতিক্রান্ত হলেও, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের খুব যে অগ্রগতি হয়েছে, তা বলা যাবে না। আমাদের কালজয়ী চলচ্চিত্রের সংখ্যাও হাতে-গোনা। বর্তমানে চলচ্চিত্র শিল্পের দিকে তাকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা প্রত্যক্ষ গহীন তমসা। বিষয় ও উপস্থাপনাসহ বর্তমান বাংলাদেশের বেশিরভাগ চলচ্চিত্রেই দৃশ্যমান হয় রুচির দুর্ভিক্ষ। সুতরাং চলচ্চিত্রের এই ক্রান্তিকালে, অতীত থেকেও আমরা নিতে পারি ঘুরে দাঁড়ানোর প্রণোদনা। আর এই প্রেক্ষাপটে, *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রের মতো কালজয়ী চলচ্চিত্রের বিশেষ অধ্যয়ন প্রয়োজন।

তবে সমকাল কিংবা পরবর্তী সময়ে, এই চলচ্চিত্র যে সর্বৈবভাবে সমাদৃত হয়েছিল – তা নয়। কেউ কেউ উপন্যাসের সাথে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনা করে দেখাতে চেয়েছেন মূল উপন্যাসে কী ছিল আর এতে কী নেই? দলিত জীবন বর্ণনে অদ্বৈত মল্লবর্মণ যেমন প্রশংসিত হয়েছেন সেই জনপদের একজন হয়ে "তল থেকে দেখা" জীবনাভিজ্ঞতার কারণে, ঋত্বিক ঘটক কখনও সমালোচিত হয়েছেন বামুনের সন্তান হয়ে নিম্নবর্গের জীবন নির্মাণের অভিযোগে। সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর গবেষক, গৌতম ভদ্র এই চলচ্চিত্রের মাঝে ঋত্বিকের মধ্যবিত্ত শ্রেণি উদ্ভূত দর্শন ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন এতে গোষ্ঠীবদ্ধ মালো জীবন চিত্রায়ণের সীমাবদ্ধতার কথা। তাঁর মতে চলচ্চিত্রটি "মধ্যবিত্তের চোখে দেখা মালোদের জীবন"-এর প্রতিরূপ যেন (ভদ্র, ২০২০: ২৭১)। একজন শিল্পীকে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জীবন সংশ্লিষ্ট রূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে সকল সময়ই কী সেই গোষ্ঠীর একজন সদস্য হতে হয়? শিল্পীর মমত্ববোধ, জীবনবোধ, শিল্প ভাষার শক্তিমত্তা আর সৃষ্টিশীলতার গুণে যে কোনো জীবনই বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারে তাঁর সৃষ্টিকর্মে – বাস্তবতা আর নান্দনিকতার সমবায়ে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোধ্যায় সম্পাদিত *নিম্নবর্গের ইতিহাস*- গ্রন্থে শিল্প নয় ববং ইতিহাসকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে এ ধরনের নির্মাণ অভ্যস্ততায়। সেখানে বলা হয়েছে: "ক্ষমতাশীল উচ্চবর্গের দ্বারা নিম্নবর্গের নির্মাণ-এর নিদর্শন আমরা পাই ইতিহাসের দলিলে" (চট্টোপাধ্যায়, ২০১২: ১৮)। তবে একথাও সত্য যে, শ্রেণি বিভক্ত সমাজে শিল্পের বাস্তবতায় অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয় আধিপত্যবাদীদের বাস্তবতা। ঋত্বিককে কী আমরা সর্বতোভাবে আধিপত্যবাদীদের কাতারে ফেলতে পারি? গৌতম ভদ্রসহ অনেকেই তাঁকে মধ্যবিত্তের শ্রেণিতেই ফেলেছেন। কলকাতা-কেন্দ্রিক ঋত্বিকের যে মধ্যবিত্ত জীবন– সে জীবনে ছিল দেশ হারানোর ক্ষত। এই ক্ষত তাঁকে বঞ্চিত ব্রাত্যজনের বেদনার সাথে যেন এক সুতোয় গ্রন্থিত করেছিল। আগেও উল্লেখ করেছি, ঋত্বিক ঘটকের বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের জলকাদায়। মূল উপন্যাসে বর্ণিত যে জীবন, তা ঋত্বিকের পরিচিত। শৈশব-কৈশোরে, সে জীবনকে তিনি দেখেছেন অত্যন্ত কাছ থেকে। এ বিষয়ে ঋত্বিকের উক্তি: "তিতাস উপন্যাসের সেই পিরিয়ড হচ্ছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেরকার, যা আমাদের চেনা, ভীষণভাবে চেনা। তিতাস উপন্যাসের অন্য সব মহত্ব ছেড়েও দিয়েও এই ব্যাপারটা আমাকে প্রচণ্ডভাবে টেনেছে। ফলে তিতাস একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি গোছের সেই ফেলে আসা জীবনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে" (চিত্রবীক্ষণ উদ্ধৃত হয়েছে কায়সার-এ ২০০১: ২০৬-৭)। সুতরাং "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসে বর্ণিত জীবন ঋত্বিকের অভিজ্ঞতায় না দেখা কোনো জীবন নয়, তাঁর মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্র সত্ত্বেও। আবার কোনো কোনো সমালোচক তাঁর মধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থানকে দেখেছেন এ চলচ্চিত্র নির্মাণের পক্ষে হ্যাঁ-বোধক

হিসেবে।[১] তাঁর এই শ্রেণি অবস্থানের কারণে এ ছবির বিষয়ের সাথে তাঁর যে দূরত্ব, তা তাঁকে দিয়েছে বিষয়ের নির্মোহ উপস্থাপনার শৈল্পিক সক্ষমতা।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সমালোচক চিন্ময় মুৎসুদ্দীও এই চলচ্চিত্রকে বলেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসের "অসার্থক চিত্ররূপ" (২০০১খ: ১৫১)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একজন গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র সমালোচক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা আলমগীর কবিরকেও এই চলচ্চিত্রের নেতিবাচক সমালোচনায় মুখর হতে দেখি। আলমগীর কবির অবশ্য এই চলচ্চিত্র নির্মাণকালে ঋত্বিকের অসুস্থতাকে দেখেছেন এই চলচ্চিত্র নির্মাণে তাঁর (কবিরের) অনুসন্ধান করা ক্রুটিগুলোর মুখ্য কারণ হিসেবে (Kabir, 2001: 147)। ঋত্বিক তাঁর অনেক চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় অসুস্থ ছিলেন, একথা সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর শিল্পভাষার বলিষ্ঠতায় কখনওই দৃশ্যমান হয়নি তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট বা রুগ্নতার চিহ্ন। এ কারণেই সত্যজিৎ রায়ের মতো কালজয়ী ও সূক্ষ্ম-শুদ্ধ নির্মাণ অনুরাগী চলচ্চিত্র নির্মাতাকে বলতে শুনি: "[...] আশ্চর্য লেগেছে যে, তাঁর কোনো ছবি দেখে কখনও মনে হয়নি সেই অসুস্থতা এতটুকুও, এতটুকুও সেই ছবির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে" (রায়, ২০২০: ২৯)। সত্যিকার অর্থে, আমাদের চলচ্চিত্র অবলোকন অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতাই অনেকাংশে দায়ী ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের যথাযথ রসাস্বাদন ও মূল্যায়ন না করতে পারার ক্ষেত্রে। এ ছাড়াও রয়েছে, চলচ্চিত্র ও উপন্যাসকে দুই পৃথক আঙ্গিক হিসেবে বিবেচনা না করতে পারার ব্যর্থতা।

তবে, সকল বাঙালি সমালোচকই যে, *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর নেতিবাচক সমালোচনায় উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন, বিষয়টি তেমন নয়। অনেকেই এই চলচ্চিত্রের উচ্চকিত প্রশংসা করেছেন। কেউ কেউ এর বিষয়ের মাঝে খুঁজে পেয়েছেন মহাকাব্যিক বিস্তার। উদারণস্বরূপ, চলচ্চিত্র গবেষক ও নির্মাতা সাজেদুল আউয়ালকে উদ্ধৃত করা যায়। তিনি এই চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে বলেন: "এর বিষয়বস্তু এপিকধর্মী" (আউয়াল, ২০১০: ২০২)। এভাবে শুধুমাত্র বিষয়ের প্রসঙ্গ টেনে এ চলচ্চিত্রের মূল্যায়নও যেন খণ্ডিত।

শ্রব্য ও দৃশ্যের সমন্বিত শিল্প – চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রের কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ, দৃশ্য, শট, শটের বিন্যাস, আলো, শব্দ, সংগীত, অভিনয়, ফ্রেমের ভেতরে অবস্থিত নানা বস্তুর বিন্যাসসহ ইত্যাদি নানা বিষয় চলচ্চিত্রের ভাষা ও অভিঘাতকে প্রভাবিত করে। চলচ্চিত্রে অর্থও সৃষ্টি হয় নানা স্তরে। সেই নানা স্তরের পাঠোদ্ধার করতে ব্যর্থ হন আমাদের অনেক চলচ্চিত্র সমালোচকই। এঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ইতোমধ্যে। সুতরাং *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রের অনুধাবন, বিশ্লেষণ কিংবা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় – তা অনেক ক্ষেত্রেই (হলিউড অনুসৃত) প্রচলিত চলচ্চিত্র দর্শনজাত অভ্যস্ততা থেকে সৃষ্ট।

---

১. ইরাবান বসুরায় *অযান্ত্রিক* ও *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্র দুটিকে ঋত্বিকের সবচেয়ে সার্থক দুটো চলচ্চিত্র হিসেবে উল্লেখ করেন। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন: "অযান্ত্রিক ও তিতাস একটি নদীর নাম' এর চরিত্রগুলি ঋত্বিকের পরিচিত মধ্যশ্রেণির নয় অন্য ছবিগুলোর মতো; সে জন্যই এ ছবিদুটিতে এক দূরত্ব বা নিরাসক্তি কাজ করেছে – যা এদের শৈল্পিক সার্থকতার জন্য প্রয়োজন ছিল।" -ইরাবান বসুরায়, "জীবন, চলচ্চিত্র, রাজনীতি এবং ঋত্বিক কুমার ঘটক"। রজত রায় সম্পাদিত *ঋত্বিক ঘটক*-এ সংকলিত। (কলকাতা: প্রতিভাস, ২০২০), পৃ. ৬৭।

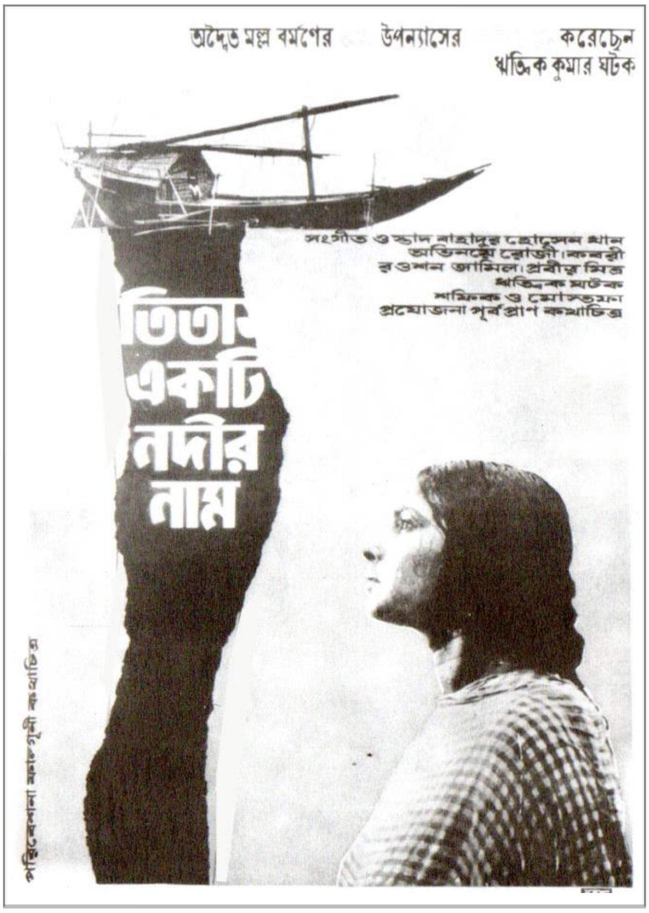

চিত্র ১. *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রের পোস্টার; প্রচ্ছদ নির্মাণ করেছেন আব্দর সবুর।[২]

চলচ্চিত্র মাধ্যটিকে একটি ঔপনেবেশিক মাধ্যমও বলা চলে, যার উদ্ভব পশ্চিমে। পশ্চিমা এই মাধ্যমটিকে আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে পশ্চিমা প্রভাব দ্বারা আমরা কমবেশি প্রভাবিত। আমাদের দেশে প্রচলিত চলচ্চিত্রের যে আদল নির্মিত হয়েছে তা অনেকাংশেই নাটকীয় কাঠামোর এবং পরিসমাপ্তি অভিমুখী। একজন নায়ক-কেন্দ্রিক কাহিনিতে ঘটনার আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত যে বিস্তার তাতে একক চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়। প্রচলিত চলচ্চিত্রে দৃশ্য নির্মাণ ও ঘটনা প্রবাহের মাঝে প্রকৃত বাস্তবতা নয়, বরং বাস্তবতার প্রতীতি নির্মাণ প্রচেষ্টা স্পষ্ট। একই সাথে, "কারণ ও প্রভাব"-এর পারম্পর্যও সেখানে সুরক্ষিত হয়। হলিউড থেকে আমদানীকৃত এই চলচ্চিত্রিক কাঠামো থেকে দূরবর্তী ছিলেন ঋত্বিক ঘটক। প্রাচ্যের মহাকাব্য *রামায়ণ* বা *মহাভারত* যেমন নির্দিষ্ট চরিত্র বা ঘটনার ওপর গুরুত্ব আরোপের চাইতেও দর্শনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে অধিক, ঋত্বিকও তেমনি এ চলচ্চিত্রে তিতাস পাড়ের

---

২. চিত্রটি প্রাপ্তির উৎস সাজেদুল আউয়াল সম্পাদিত *ঋত্বিকমঙ্গল*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ৪৮১।

জীবনকে তুলে আনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক বর্ণিত ঘটনার পারম্পর্যকে হুবহু সুরক্ষার চাইতেও গুরুত্ব দিলেন এই ব্রাত্য জীবন প্রবাহের সমষ্টিগত রূপ, বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ ও লোকজ জীবনদর্শনকে। লোকজ জীবনাশ্রিত চলচ্চিত্রকে মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র ভঙ্গিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছ ঋত্বিকের চলচ্চিত্রিক মৌলিকত্বের কারণে। এ মৌলকত্ব বাঙালির আবহমান সাংস্কৃতিক চেতনাজাত। এ কারণেই সত্যজিৎ রায়কে বলতে শুনি: "ঋত্বিক মনেপ্রাণে বাঙালি পরিচালক ছিল, বাঙালি শিল্পী ছিল – আমার থেকেও অনেক বেশি বাঙালি। আমার কাছে সেটাই তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয়" (২০২০: ২৯)। অতএব বাঙালির শিল্পদর্শনে উদ্বুদ্ধ এই বিশেষ বাঙালি পরিচালক তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণে নিজস্ব ও দেশজ আঙ্গিকের শিল্পরীতির অনুসন্ধান ও বিনির্মাণ করবেন – সেটাই স্বাভাবিক। আর তাঁর চলচ্চিত্র যাত্রায় এই দেশজ শিল্পরীতির সবচাইতে সার্থক, নান্দনিক আর মহাকাব্যিক প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রে। ঋত্বিকের ভাষ্যেও শুনি এই চলচ্চিত্রকে তিনি বলছেন সেই বিশেষ শ্রমজীবী বাঙালিদের গীতিকবিতা হিসেবে: "*Titas Ekti Nadir Nam*, which is an essay on the lyricism of the Bengali countryside, specially its monsoons, and because I think I have been able to portray certain hefty labour-class characters who are intensely Bengali" (Ghatak, 1987: 72).

পশ্চিমা বিশ্বে, এই চলচ্চিত্রকে ঘিরে আলোচনা হয়নি সেই মাত্রায়। কখনও কারো কারো কাছে চলচ্চিত্রটি গুরুত্ব পেয়েছ, আবার কখনও বিশ্বচলচ্চিত্রের নানা আলোচনায় একেবারেই উপেক্ষিত হয়েছে এটি। World Cinema Foundation আর Cineteca di Bologna নামের প্রতিষ্ঠান দুটি একে পুনরুদ্ধার করেছে (*The Case for Global Film)*। উচ্চ মানের ভিডিও ছবিতে তারা ১৫৮ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই চলচ্চিত্রের বাংলা ও ইংরেজি লিখনি/সাবটাইটেল সম্পন্ন করেছেন। British Film Instituteও এই চলচ্চিত্রকে ঠাঁই দিয়েছিল বাংলাদেশের শীর্ষ ১০ চলচ্চিত্রের প্রথম স্থানে।[৩] আবার David Thomson রচিত *A Biographical Dictionary of Film* (1981) গ্রন্থে একটিবারের জন্যও উল্লিখিত হয়নি ঋত্বিকের নাম (*The Case for Global Film*)। দু-একজন পশ্চিমা চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক ঋত্বিকের এই চলচ্চিত্রের আলোচনায় এগিয়ে এলেও তাঁদের আলোচনায় এ চলচ্চিত্রের নানা দিকই সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। কেউ কেউ আবার বলেছেন: "[…] on first viewing the progress of character and plot can be difficult to follow" (Ibid). ভিনদেশি চলচ্চিত্রকে সাবটাইটেলের মাধ্যমে অনুধাবন করা গেলেও, এর নিবিড় পাঠোদ্ধারের জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও

৩. ২০১০ সালে British Film Institute-এর ওয়েব পাতায় সেই সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে নির্মিত শীর্ষ ১০টি ছবির একটি তালিকা (Top 10 Films of Bangladesh) লভ্য ছিল। এদের ক্রম ছিল নিম্নরূপ। লক্ষণীয়, এই তালিকার শীর্ষে আছে *তিতাস একটি নদীর নাম*:

1. *Titash Ekti Nadir Naam*	Ritwik Ghatak	1973
2. *Chitra Nodir Pare*	Tanvir Mokammel	1999
3. *Nodir Naam Madhumati*	Tanvir Mokkamel	1994
4. *Shimana Perye*	Alamgir Kabir	1977
5. *Beder Meye Josna*	Tojammel H Bokul	1989
6. *Surja Dighal Bari*	Shaik Niamat Ali & Masihuudin Shaker	1979
7. *Dhire Bohe Meghna*	Alamgir Kabir	1973
8. *Rupali Shaikate*	Alamgir Kabir	1979
9. *Srabon Megher Din*	Humayn Ahmed	1999
10. *Sat Bhai Chompa*	Dilip Shom	1968

-উপরোক্ত তালিকা প্রাপ্তির লিংক:

http://www.bfi.org.uk/features/imagineasia/guide/poll/bangladesh/ (accessed on 11 November, 2010)।

অভিজ্ঞতা। তাই এ চলচ্চিত্রকে পাঠ করতে গিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের তাত্ত্বিকদের মাঝে পরিলক্ষিত হয় সাংস্কৃতিক দূরত্ব, যা তাঁদের পাঠকে সম্পূর্ণতা দানে বাধাগ্রস্ত করেছে কখনও।

আবার সকল বাঙালি সমালোচক বা চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকগণ, যাঁরা ঋত্বিক-এর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল, তাঁরাও যে, *তিতাস*-কে যথাযথভাবে অনুধাবনে সমর্থ হয়েছেন, তাও নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি, এই চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য নিয়ে পার্থিব রাশেদ আর মনিস রফিক কর্তৃক সম্পন্ন *ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম: চিত্রনাট্য* শীর্ষক গ্রন্থের কথা। তাঁরা নিঃসন্দেহে ঋত্বিক ও *তিতাস*-এর প্রতি তাঁদের ভালোলাগা, ভালোবাসা আর দায়বদ্ধতা থেকে অগ্রসর হয়েছেন চলচ্চিত্রটি অবলোকনের মাধ্যমে এর চিত্রনাট্যের একটি কাঠামো নির্মাণে। কিন্তু তাঁদের গ্রন্থিত চিত্রনাট্যেও দেখি নানা ভুলভ্রান্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, *তিতাস*-এ সূচনা গানটিকে তারা যেভাবে গ্রন্থিত করেছেন চিত্রনাট্যে, সেখানে আছে শব্দকে ঠিকভাবে অনুধাবন ও উল্লেখ না করার প্রমাণ। যেমন, এই গানের "আরে পলকে পাহাড় ভাসে/পলকে লুকায়, আজব লীলে" এই চরণদুটো সেখানে লেখা হয়েছে এভাবে: "আরে কলঙ্কে পারে ওই ভাবে /পলকেই লুকায়/ আজব নীলে" (রাশেদ ও রফিক, ২০২০: ১২); এবং তা ভুল ভাবে লিখিত হয়েছে। চিত্রনাট্যের বিভিন্ন স্থানেও পরিলক্ষিত হয় বিভ্রম।

সুতরাং লক্ষণীয়, বাংলাদেশ, ভারত কিংবা পশ্চিমা বিশ্বে *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর মতো একটি মহাকব্যিক চলচ্চিত্রের সঠিক ও শুদ্ধ বিশ্লেষণ, কিংবা বিশেষ পাঠে দৃশ্যমান হয় নানা সীমাবদ্ধতা। তাই এই চলচ্চিত্রের নিবিড় পাঠকে নিয়ে সম্পন্ন বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধ এই বিশেষ চলচ্চিত্রের প্রতি যেমন এক ধরনের নৈবেদ্য, তেমনি একই সাথে তা দায়বদ্ধতার ভেতরও বর্তায়। নির্মাণের কাল থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্তের পরও *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্থান করে আছে এক অনন্য স্থান। এই কালজয়ী চলচ্চিত্রকে ঘিরে গবেষণা অবশ্যই দেশের চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের উপযোগী ও সহযোগী হবে। চলচ্চিত্র শিক্ষার্থী, গবেষক ও চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট লেখকদের জন্য এ ধরনের গবেষণা যেমন উপাত্ত হিসেবে কাজ করবে, তেমনি তাঁদের মাঝে যোগাবে চিন্তার খোরাক। এই গবেষণা প্রবন্ধ চলচ্চিত্রটির নিবিড় বিশ্লেষণই করবে না শুধু, একই সাথে এতে আলোচিত হবে চলচ্চিত্রটির নির্মাণ-প্রেক্ষাপট, এর পরিচালকের শিল্পভাবনা ও রাজনৈতিক দর্শন, এই চলচ্চিত্রের প্রদর্শন ও অভিঘাত সম্পর্কিত নানা দিক। চলচ্চিত্রটির বিশেষ পাঠে প্রযুক্ত হয়েছে চলচ্চিত্রের মহাকব্যিক নির্মাণকৌশল সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো। এ ছাড়াও নতুন প্রজন্মের যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চলচ্চিত্র শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে, প্রত্যাশা করি তাদের অনেকেই চলচ্চিত্র পরিচালনায়ও অংশ নেবে কোনো এক সময়। সুতরাং তাদের জন্যও – এ চলচ্চিত্র আর এ চলচ্চিত্রকে ঘিরে আধুনিক রীতি-পদ্ধতির গবেষেণা – প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। সবমিলিয়ে, *তিতাস একটি নদীর নাম* বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন, যার আবেদন কালোত্তীর্ণ। আর এ কারণেই এই চলচ্চিত্রের গবেষণা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র তথা শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক।

চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রেক্ষাপট ও প্রেরণা

তিতাস একটি নদীর নাম চলচ্চিত্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৭২ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে (হায়দার ও আবদুল্লাহ, ২০০১: ৪১)। এক বছর সময়ের ভেতরেই সম্পন্ন হয় এর নির্মাণ ও মুক্তির প্রক্রিয়া। এর মুক্তি তারিখ ২৭ জুলাই, ১৯৭৩ সাল (প্রাগুক্ত: ৪১)। চলচ্চিত্রটির নির্মাণের প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে আমরা দেখি, সদ্য স্বাধীন হওয়া যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল এই মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ। এই চলচ্চিত্রের প্রযোজক ছিলেন বাংলাদেশের হাবিবুর রহমান খান, এন এম চৌধুরী বাচ্চু, ও ফয়েজ আহমেদ পূর্বপ্রাণ কথাচিত্র-এর পক্ষে। তিনজন ব্যক্তি এই

চলচ্চিত্রের প্রযোজনায় সংশ্লিষ্ট থাকলেও, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে হাবিবুর রহমান খান-এর সাক্ষাৎকারই আমরা পাই।

চলচ্চিত্র প্রযোজক হিসেবে *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়েই শুরু হয় হাবিবুর রহমানের খানের চলচ্চিত্র প্রযোজনার যাত্রা। বাংলাদেশের প্রকৃত রূপ চলচ্চিত্রে ধারণের আকাঙ্ক্ষা ও একই সাথে চলচ্চিত্রে সেই বিশেষ রূপ নির্মাণের প্রধান কারিগর অর্থাৎ পরিচালক হিসেবে ঋত্বিক ঘটককে পাওয়া হাবিবুর-এর জন্য ছিল এক দুর্লভ সৌভাগ্য আর আনন্দের বিষয়। যদিও চলচ্চিত্র তৈরির প্রক্রিয়ায় ঋত্বিক ঘটকের সেই সময়ের জীবনাচারণ প্রযোজক হাবিবুরকে কখনও কখনও অল্পবিস্তর সমস্যার মুখোমুখিও করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> [...] 'তিতাস' তৈরির দশ বছর সময় ধরে [তিনি] কোনো ছবি তৈরি করতে পারেননি। 'তিতাসের' কাজ চলবার সময় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ছবির কাজে তাঁর প্রয়োজন মিটিয়ে চলতে, তবুও তিনি যেমন অনেকটা খামখেয়ালির বশে, কখনও বা প্ল্যানিং-এর অভাবের কারণে, কখনও আমাকে আর কখনও পুরো ইউনিটকে অনেক রকম অসুবিধায় ফেলেছেন (প্রাগুক্ত: ৩৯)।

এই চলচ্চিত্র নির্মাণের আগে ঋত্বিক দশ বছর ছবি তৈরি করেননি বলে প্রযোজক এখানে যে হিসেব দাঁড় করালেন, তাতে সত্যতা থাকলেও, নেই অনেক তথ্যের স্পষ্ট প্রকাশ। এই দশ বছর সময়কালের ভেতর ঋত্বিক হয়ত কোনো কাহিনি ছবি নির্মাণ করেননি, তবে বেশ কিছু তথ্যচিত্র ও নিরীক্ষাধর্মী ছবি সম্পন্ন করেছেন তিনি। এগুলোর ভেতর *Fear* (1964-65), *Rendezvous* (1965), *আমার লেনিন* (১৯৭০), *পুরুলিয়ার ছৌ* (১৯৭০) *দুর্বার গতি পদ্মা* (১৯৭১) অন্যতম। এ সময়ে শুরু করেছিলেন অনেক কাহিনিচিত্রও, যেগুলো সমাপ্তির পথে এগোয়নি। আবার এই সময়কালের ভেতর তিনি শিক্ষকতা করেছেন পুনেতে অবস্থিত ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়া-তে। তাঁর শিক্ষকতার আলোক স্পর্শ যাঁরা পেয়েছিলেন, পরবর্তী সময়ে তাঁদেরই দেখি ভিন্নতর শৈল্পিক সম্ভাবনা নিয়ে বিকল্প চলচ্চিত্র সৃজনে জ্বলে উঠতে। এদের ভেতর মনি কাউল, কুমার সাহানী, আদুর গোপাল কৃষ্নান, জন আব্রাহাম অন্যতম। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে চলচ্চিত্র সৃষ্টি সংক্রান্ত যে প্রেরণা তিনি সঞ্চার করেছিলেন, তাতে তাদের চলচ্চিত্র যজ্ঞ নিয়েও তিনি ভীষণ আশাবাদী ছিলেন: "I have contributed at least a little in their luck which is much more important than my own film making" (উদ্ধৃত করেছেন খসরু, ২০০১: ৬২)। সুতরাং লক্ষণীয়, *তিতাস* নির্মাণের সমসাময়িক সময়ে ঋত্বিকের জীবনাচারণে আত্মধ্বংসকারী হেয়ালী-প্রতিভা (Self-destructive wastrel-genus) হিসেবে তাঁর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা অনেকের মুখে শোনা যেত – তাতে সত্য চাপা পড়ত অনেকাংশেই।

চিত্র ২. ঋত্বিক ঘটকের স্কেচ

তবে একথাও মিথ্যে নয় যে, এ সময়ে ঋত্বিক ঝুঁকে পড়েছিলেন অসংযতভাবে মদ্যপানে। তাঁর শরীরও ভাঙতে শুরু করেছিল। ব্যক্তিগত জীবনেও একাকী থাকতেন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। অনেক ক্ষেত্রেই, শ্যুটিং এগোয়নি কাঙ্ক্ষিত গতিতে। প্রযোজকের দাবি, লোকেশনে গিয়ে শ্যুটিং না করে ফিরে আসা, অতিদ্রুত চলচ্চিত্রের নানা উপকরণ যোগাড়ের দাবি, কিংবা বিভিন্ন ছোটোখাটো কারণে প্রযোজনার নির্মাণ খরচ বৃদ্ধির মাঝে ঋত্বিক যেন এক ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের আনন্দ পেতেন (হায়দার ও আবদুল্লাহ, ২০০১: ৪০)। বামপন্থি চিন্তাধারার ঋত্বিক নাকি স্পষ্ট করেই উত্তর দিতেন এ ধরনের শ্যুটিং ব্যয় নিয়ে: "গরিব মানুষদের কিছু পাইয়ে দিলাম, বুর্জোয়ার কিছু গেল" (প্রাগুক্ত: ৪১)।

ঋত্বিকের সেই সময়ের জীবনভঙ্গিতে কখনও অসংযম আচরণ (যেমন, হঠাৎই পানীয় জোগাড়ের আব্দার), কখনো-বা অগোছালো ভাব, আবার কখনও ছেলেমানুষিতে ভরা নানা কাজকর্মের কথা প্রযোজক উল্লেখ করলেও ঋত্বিক যে শেকড়ের প্রতি বিশেষভাবে নিবেদিত ছিলেন, সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে প্রযোজক বিস্মৃত হন না। প্রযোজকের সাক্ষাৎকার থেকেই আমরা জানতে পারি যে, শ্যুটিং-এর সময় লোকেশনে গিয়ে তিনি প্রায়ই আজলা ভরে তিতাসের পানিতে মুখ মুছে নিতেন (প্রাগুক্ত: ৩৯)। এ যেন তিতাসের সাথে তাঁর এক আবেগী সংযোগ। আবার শ্যুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে তিনি গ্রামের অসংখ্য সাধারণ মানুষের সাথে মিশেছেন। কখনও কারো ডাকে উঠে বসেছেন তাদের বাড়ির দাওয়ায়, ডাল-ভাতের অতিথি হয়ে। এভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় তিনি সাধারণ মানুষের "নাড়ীর স্পন্দনটাকে" বুঝতে চেষ্টা করেছেন (খসরু, ২০০১: ৬৩)। সুতরাং বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষ – এই দুই সত্তাকে ঋত্বিক যেমন বুঝতে চেয়েছেন ছবি নির্মাণের সময়, তেমনি চলচ্চিত্রেও তারা আছে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে।

সবমিলিয়ে বাংলাদেশের প্রকৃতি, মানুষ আর ঐতিহ্যের প্রতি ঋত্বিক এক গভীর টান অনুভব করতেন। তিনি জন্মেছিলেন বাংলাদেশের জিন্দাবাজারে ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর। তাঁর বেড়ে ওঠাও এই বাংলায়। আদিবাড়ি পাবনাতে। শৈশব-কৈশোরের অনেকটা সময় তাঁর কেটেছে রাজশাহীতে। দেশভাগ হলে পরিবারসহ তিনি চলে যান ভারতে। কবিতা, গল্প রচনা দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকর্মের শুরুটা হলেও এক সময় গণনাট্য আন্দোলনে সক্রিয় হন। গণনাট্য আন্দোলনে কাজ করার সময় পূর্ব বঙ্গের আর এক কৃতি সন্তান অভিনেতা উৎপল দত্ত "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন ও মঞ্চস্থ করেন। সে সময়ই ঋত্বিকের মনে জন্মেছিল এই উপন্যাসকে চলচ্চিত্রায়ণের বাসনা (কায়সার, ২০০১: ২০৬)। অবশ্য, সে সময় পর্যন্ত তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ শুরু করেননি। নাট্যাভিনয়, নাটক রচনা আর নাট্যপরিচালনার পর তিনি বেছে নেন চলচ্চিত্রকে নিজ বক্তব্য প্রকাশের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে। তবে তাঁর সৃষ্টির ভেতর সবময়ই উঠে এসেছে বিপন্ন মানুষের কথা, বাস্তুচ্যুত হওয়ার যন্ত্রণা আর দেশভাগের বেদনা। তাই *তিতাস* চলচ্চিত্রটি নির্মাণের সুযোগ এলে তিনি যেন ফিরে যান তাঁর সেই ফেলে আসা মাতৃভূমির কাছে:

> Naturally a nostalgic yearning for East Bengal drove me to *Titas* and to make a film on it. The period delineated in the novel *Titas* dates back to a past that lived some fifty years back. I knew the time. So *Titas* has become a tribute to the days that I left behind (Rajadhyaksha and Gangar, 1970 : 98).

মাতৃভূমি নিয়ে গভীরভাবে স্মৃতিকাতর ঋত্বিক ১৯৭২ সালে *তিতাস* নির্মাণে বাংলাদেশে ছুটে এলেও তিনি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পান না তাঁর অতীত স্মৃতির বাংলাদেশকে। তাঁর মনে হয়েছে ইতিহাস এই দেশের অনেক সুন্দর বিষয়কে নষ্ট করে ফেলেছে, যা তিনি অতি যত্নে রেখেছিলেন তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে। আক্ষেপের সাথে তাঁকে বলতে শুনি: "[...] সেই অতীতের ছিটেফোঁটা আজ আর নেই। [...] কিস্‌সু নেই, সব হারিয়ে গেছে" (বসুরায়, ২০২০: ৭৮)। সত্যিকার অর্থে, ঋত্বিক বাংলাদেশের যে

স্মৃতিকে তাঁর মনের ভেতর আঁকড়ে রেখেছিলেন, তা ছিল স্থির। যখন একটা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তিনি বাংলাদেশে এসেছেন, তখন সময়ের ব্যবধানটাকে ভুলে তিনি তাঁর অতীতে দেখা সেই স্থির সময় বা স্মৃতিটাকেই হয়ত খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। আর হতাশ হয়েছেন সেই স্মৃতিময় বাস্তবতার পরিবর্তন দেখে। অবশ্য তিনি যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতাকেও দেখেছেন সহানুভূতির দৃষ্টিতে।

যুদ্ধের অব্যবহিত পর, বাংলাদেশের তৎকালীন পটভূমিতে চলচ্চিত্র তৈরি করতে যেয়ে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেও ঋত্বিক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, এ রকম পরিস্থিতিতে *তিতাস*-এর মতো চলচ্চিত্র নির্মিত হতে দেখে। চলচ্চিত্রটির কাজকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র প্রযোজকের সহযোগী মনোভাব ও উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন ঋত্বিক: "সত্যি কথা বলতে কি কোলকাতায় আমি ছবি তৈরি করছি প্রায় সাতাশ বছর ধরে। তবে এরকম উদ্যোগী প্রযোজকের দেখা সেখানে বড় একটা পাইনি" (*চিত্রালী* উদ্ধৃত করেছেন আউয়াল ২০০১: ৩৪)। প্রযোজকও ঋত্বিকের কাজের সময়ে উদ্ভূত নানা ঝামেলার কথা ভুলে যান, পরিসমাপ্তিতে তাঁর কাজের শিল্পিত রূপ অবলোকনের পর। এ কারণেই ঋত্বিক প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যায়ন: "[...] উপমহাদেশের কেউই তাঁর পাশে দাঁড়াতে পারবে না। বিশ্বের অন্যতম পরিচালক [তিনি]" (হায়দার ও আবদুল্লাহ, ২০০১: ৪৪)।

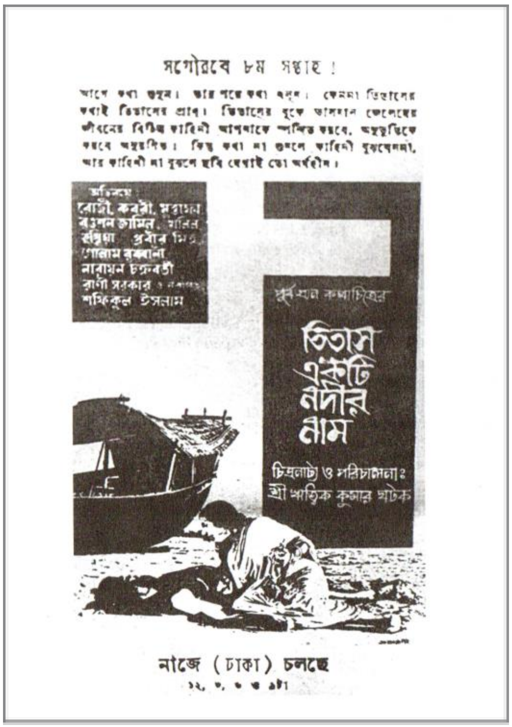

চিত্র ৩. *তিতাস একটি নদীর নাম* মুক্তির কালে পত্রিকায় প্রকাশিত এই চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন।

আগেই উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশে *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর মুক্তির তারিখ ২৭ জুলাই, ১৯৭৩ সাল। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে এই ছবির মুক্তি দেয়া হয়। ঢাকার নাজ সিনেমা হলে সে সময় চলচ্চিত্রটি ৮ সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শিত হয় (চিত্র ৩)। কলকাতায় ছবিটি মুক্তি পায় এর প্রায় ১৮ বছর পর – ১৯৯১ সালের ১১ মে তারিখে। এই চলচ্চিত্রের দুটি রূপ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা যায়। দ্বিতীয়টি প্রথমটির চাইতে কিছুটা স্বল্প আয়তনের, যার সম্পাদনা করেছিলেন ঋত্বিক

ঘটক নিজে।[৪] বাংলাদেশে চলচ্চিত্রটির প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ২৬ জুলাই মধুমিতা সিনেমা হলে (*Morning News,* 1973: 6)। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শেখ আবদুল আজিজ। ঋত্বিক ঘটক শারীরিক অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। তবে তিনি শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান – যা পড়ে শোনানো হয়:

> আমাকে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশে ভালো ছবি তৈরি করার মতো ভালো কলা-কুশলী নেই, দক্ষ অভিনয়ের জন্য ভালো শিল্পী নেই। কিন্তু বাংলাদেশে 'তিতাস' সৃষ্টি করতে গিয়ে সে ধারণা আমার কাছে সম্পূর্ণ ভুল বলে মনে হয়েছে। আমি জোর গলায় বলবো বাংলাদেশের শিল্পী ও কলা-কুশলীদের দ্বারা যে কোনো ভালো ছবি করা সম্ভব (*চিত্রালী* উদ্ধৃত করেছেন আউয়াল ২০০১: ১০৫)।

সত্যিকার অর্থে, মুক্তির সময়ে *তিতাস*-এর মতো মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রের দর্শক গ্রহণযোগ্যতা তেমন ছিল না। প্রথমত স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে দর্শকও সেভাবে গড়ে ওঠেনি – পুরো দেশ জুড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সময়ের দর্শক ছিল মূলত শহর-কেন্দ্রিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণির। আর এ শ্রেণির দর্শকের চলচ্চিত্র দর্শন অভিজ্ঞতা কিংবা চাহিদা ছিল একক নায়ক-নায়িকা-নির্ভর, নাচ ও গানে ভরা মিলনান্তক ঘটনার নাটুকে ও মেলোড্রামাটিক চলচ্চিত্রের প্রতি। ঋত্বিকের *তিতাস*-এর মাঝেও নাটকীয়তা ও মেলোড্রামা যে ছিল না – তা নয়। তবে সেই নাটকীয়তা একক জীবনকেন্দ্রিক নয়, বরং তা অসংখ্য জীবনের মাঝে ছড়ানো। আর সেখানে মেলোড্রামা এসেছে তিতাস আর তিতাস পাড়ের মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সংগীতময় আবেগ প্রকাশের মাধ্যম হয়ে। সবমিলিয়ে, *তিতাস*-এর নির্মাণে ঋত্বিক যেমন অপরিহার্য ছিল, তেমনি প্রাসঙ্গিক ছিল নদী বিধৌত বাংলাদেশের লোকেশন, শিল্পী আর কলাকুশলীরা। আর এই চলচ্চিত্র একটি নতুন দেশের চলচ্চিত্রিক অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এক চিরকালীন চলচ্চিত্রের মহিমা লাভ করেছে – তা আজ এক ঐতিহাসিক সত্যই বলা চলে ।

মহাকাব্য, মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র ও *তিতাস একটি নদীর নাম*

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যেহেতু *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রে মালো জীবন বাস্তবতার মহাকাব্যিক নির্মাণ অনুসন্ধান, তাই শুরুতেই প্রয়োজন মহাকাব্যের স্বরূপ ও চলচ্চিত্রিক মহাকাব্যের রূপ বিষয়ে আলোচনার অবতারণা। আর এরই ধারাবাহিকতায় (প্রবন্ধের পরবর্তী অংশগুলোতে) উঠে আসবে চলচ্চিত্রে ব্রাত্যজনের মহাকাব্য নির্মাণের প্রসঙ্গ ও সম্ভাবনার দিকগুলোও, যা আমরা *তিতাস*-এ দেখি।[৫] বাংলা 'মহাকাব্য' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Epic', যার উৎস প্রাচীন গ্রিক শব্দ 'Epos'। আদিতে Epos বলতে বুঝাত 'শব্দ'। পরে, এর অর্থ রূপান্তরিত হয়েছে নানা ভাবে। কখনও বর্ণনা বা কাহিনি, কখনও কবিতা, কাব্য কিংবা গান হিসেবে এর অর্থ দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত এই Epos শব্দের অর্থ লাভ করে বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা বা কাব্যের মহিমা। বাংলা বা সংস্কৃত ভাষায় 'মহাকাব্য' শব্দটির মাঝে লুকিয়ে আছে 'মহৎ' শব্দের দ্যোতনা। ইংরেজিতে Epic শব্দটিও বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়

---

৪. "The film exists in two versions, the second being c.30' shorter and apparently cut by Ghatak himself." -Ashish Rajadhyaksha and Paul Willemen, *Encyclopaedia of Indian Cinema* (New Delhi: BFI Publishing and Oxford University Press, 1998), pp. 419.

৫. *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রকে সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে কখনও কখনও উল্লেখ করা হয়েছে *তিতাস* হিসেবে।

কখনও। অনেক ক্ষেত্রেই এটি কোনো বিষয়ের বিশালত্ব বা তীব্রতাকে নির্দেশ করে। Epic-এর সংজ্ঞায় *A Dictionary of Literary and Thematic Terms* গ্রন্থে বলা হয়েছে:

> In its original sense, the term [Epic] refers to a long narrative poem that focuses on a heroic figure or group, and on events that form the cultural history of a nation or tribe. The epic hero undergoes a series of adventures that test his valor, intellect, and character (Quinn, 2006: 140).

মহাকাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অ্যারিস্টটল বলেছেন, আদি, মধ্য ও অন্তের সমন্বয়ে বর্ণনাধর্মী কাব্যের কথা যা বীরোচিত ছন্দে রচিত। একই সাথে, তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন মহাকাব্যের একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়া ও জৈব ঐক্যের ওপর (Aristotle, 2000: 32)। তিনি ইতিহাস থেকে এর স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ইতিহাস একটি কালসীমার মধ্যে অনেক ক্রিয়া, মানুষ ও ঘটনার বর্ণনা করে। অন্যদিকে, মহাকাব্য একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়াকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। যে কারণে মহাকাব্যের কেন্দ্রে থাকে একজন মহান ও বীরোচিত চরিত্র, যাকে ঘিরে ঘটতে পারে সংখ্যাতীত ও বিচিত্র ঘটনা। একই সাথে, এর মূল ক্রিয়াকে সমুন্নত রেখে এই কাব্যে সংযুক্ত হতে পারে লৌকিক ও অতিলৌকিক অসংখ্য চরিত্র। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণও মহাকাব্যের পটভূমি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বিস্তৃত হবে বলে মনে করেছেন (দাশ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ: ৫০)। তাঁদের মতে, মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত রস হবে এই কাব্যের মুখ্য তিন রস। এর নায়ক হবে সমুদয় সদ্‌গুণে গুণান্বিত। নায়কের জয় নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে হবে মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি।

আদি মহাকাব্যগুলো অনেক সময় পাঠ করা হতো আসরে। সময়ের ক্রমবিবর্তনের ধারায় এরা লোকমুখে চর্চিত হয়ে এসেছে। এমন ধারণাও জন্মে যে, এদের বিস্তৃতিতে অসংখ্য লেখকের ভূমিকা রয়েছে। এ কারণেই মহাকাব্যের বিষয়ে প্রতিফলিত হয় একটি ভূখণ্ডের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনাচারণের বিচিত্র রূপ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাকবিদের নির্বিশেষ পরিচয় ও তাঁদের রচনা রীতির জনপদ সংলগ্নতা সম্পর্কে বলেন: "ইঁহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতলজঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয় দান করিয়াছে" (১৪০২ বঙ্গাব্দ: ৭১১)। রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যকে একটি দেশ বা জনপদের "চিরকালের ইতিহাস" হিসেবেও উল্লেখ করেছেন (প্রাগুক্ত)। কারণ মহাকাব্যে বর্ণিত ইতিহাস কালের সীমাকে অতিক্রম করে বটে, কিন্তু একটি জনপদের চিরকালীন বৈশিষ্ট্যসমূহ এতে সমুজ্জ্বল থাকে। যে কারণে শুধু যুদ্ধ-সংঘাতকে ঘিরে বীররস-নির্ভর ঘটনাই এই কাব্যের মুখ্য নয়। বরং "তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে" (প্রাগুক্ত: ৭১৩)। অতএব এ কথা বলা চলে যে, মহাকাব্য তার দীর্ঘায়তন, ওজস্বী ভাষা, অখণ্ড ক্রিয়া, কেন্দ্রীয় চরিত্রের মহান চিত্রায়ণের পাশাপাশি তুলে আনে একটি জাতির চিরকালীন সাংস্কৃতিক প্রবণতা।

এবারে আসা যাক, মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রের ধারণা প্রসঙ্গে। চলচ্চিত্র মাধ্যমটি যেহেতু অন্যান্য শিল্প মাধ্যম বা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার চাইতে নবীনতর, এই শিল্পে মহাকাব্য অনুষঙ্গটির সংযোজন সাম্প্রতিক। "[…] at the end of the twentieth century, the term 'epic' has been applied loosely in cinema to describe films of either great duration or spectacular effects or both." (Johns-Putra, 2006: 188)। বৃহৎ আয়তন ও বিস্ময়কর দৃশ্য সৃষ্টির কৌশল ও প্রবণতা নিয়ে চলচ্চিত্রিক মহাকাব্য বা মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রের আবির্ভাব বিশ শতকের শেষে হলেও, এই চলচ্চিত্র ঘরানা মূলত হলিউড সৃষ্ট। বিষয় হিসেবে এই ধরনের চলচ্চিত্রগুলো বেছে নেয় সাধারণত কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনি। এ কারণে এই চলচ্চিত্রগুলোর জন্য প্রয়োজন হয় বিশালাকৃতির যুগধর্ম নির্দেশক সেট নির্মাণ, সহস্র চরিত্রের সমাবেশ, একজন পর্বত প্রমাণ কেন্দ্রীয় চরিত্র ও সেই চরিত্রের জন্য একজন অত্যন্ত সফল ও তারকা খ্যাতি সম্পন্ন অভিনেতা নির্বাচন, এবং কারিগরি দিক

থেকে বিভিন্ন অভিনব পদ্ধতির প্রয়োগ। এ সকল উপাদানের সরবরাহে হলিউডের মতো বাণিজ্য-নির্ভর চলচ্চিত্র শিল্পের রয়েছে যথেষ্ট সক্ষমতা। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রেই এই ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণের সংখ্যা অধিক। চলচ্চিত্র গবেষক Susan Hayward-কেও বলতে শুনি এই চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে যে, এগুলো predominantly an American genre (Hayward, 2005: 103)। এর পরোক্ষ সমর্থন দেখি অন্যান্য গবেষকদের লেখাতেও: " 'epic film' refers to a significant number of films produced mostly in Hollywood in the 1950s and 1960s" (Johns-Putra, 2006: 189)। এ ছাড়াও এই চলচ্চিত্রসমূহের অতীত নির্মাণে রয়েছে এক ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য – যার লক্ষ্য ছিল (অন্তত যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তির ক্ষেত্রে) জনগণকে সোনালি অতীতের স্মৃতিতে ভাসিয়ে দেশের আধিপত্য ও বিশালত্বের দিকটি ফুটিয়ে তোলা।

মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রগুলোর আধিক্য ১৯৫০-৬০ এর দশকে হলিউডে পরিলক্ষিত হলেও, চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নানা সময়ই এরা নির্মিত হয়েছে। অনেকেই D. W. Griffith-এর *Birth of a Nation* (1915)-কে এই চলচ্চিত্র ঘরানার আদি উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তী কালের মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রগুলোর মাঝে *The Ten Commandments* (1923), *Ben Hur* (1926), *The King of Kings* (1927), *Cleopatra* (1943) উল্লেখযোগ্য। সাধারণত মহান, শক্তিশালী ও বীরোচিত পুরুষ চরিত্রকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করেছে এই চলচ্চিত্রগুলো। তবে এর ব্যতিক্রম *Cleopatra*। এই চলচ্চিত্রে দেখি, বলিষ্ঠ ও আকর্ষণীয় কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র। এই নারী নির্মাণের মাঝে প্রত্যক্ষ করা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের এক আহ্বান। একুশ শতক শুরুর কিছু আগেই নির্মিত হয় *Gladiator* (1998)। এর পরেই আমরা দেখি হোমারের ইলিয়াডের ওপর মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র *Troy* (2004)-এর নির্মাণ। পশ্চিমা বিশ্বে মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণের পেছনে ইতিহাসকে বিশালাকারে উপস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা যেমন ছিল, তেমনি এদের নির্মাণে অনেক ক্ষেত্রেই ক্রিয়াশীল ছিল রক্ষণশীল রাজনীতি ও ভোগবাদী বুর্জোয়া আদর্শ। অধিক ব্যয় আর নানা বিস্ময়কর কৌশল প্রয়োগে সম্পন্ন এই চলচ্চিত্রগুলো নিঃসন্দেহে দর্শককে হলমুখী করেছিল। একই সাথে, টেলিভিশন মাধ্যমের উদ্ভব, বিকাশ আর জনপ্রিয়তার কারণে চলচ্চিত্রশিল্প নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের কৌশল হিসেবে এসকল চলচ্চিত্র নির্মাণে অগ্রসর হয়েছে (ibid: 191)।

উপরে আলোচিত পশ্চিমা মহাকাব্যিক চলচ্চিগুলোর মতো, *তিতাস* নির্মাণের পেছনেও কী ছিল কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা ভোগবাদী বুর্জোয়া আদর্শ? এ বিচারে আমরা দেখি, সদ্য স্বাধীন একটি দেশ যেখানে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল তার যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাস্তবতা আর ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে, সেখানে চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের তেমন কোনো চিন্তা অন্তত সরকারের মাথায় আসেনি। আর এ চলচ্চিত্র সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়ও নির্মিত হয়নি। এদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের অবকাঠামোগত দিকটিও যে তখন খুব শক্ত ছিল – তাও নয়। কেউ কেউ তখন মুক্তিযুদ্ধকে বিষয় হিসেবে বেছে নিলেও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালি নারীর ধর্ষণ দৃশ্যের নির্মাণকে মুখ্য করেছে বাণিজ্যিক উপযোগ হিসেবে।[৬] যুদ্ধ ছবি তৈরির এই বিপুল হিড়িকের মাঝে *তিতাস*-এর কাহিনি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। আর এই ছবির নবীন প্রযোজক হাবিবুর রহমান খানও এই চলচ্চিত্রকে

---

৬. এ ধরনের চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে আলমগীর কবিরকেও বলতে শুনি: "[...] বুঝতে পারলাম যে পাকিস্তানি হার্মাদ কর্তৃক আমাদের মা-বোনদের ধর্ষণের চলচ্চিয়াণের মধ্যে বিরাট একটা বাজারি সম্ভাবনা রয়ে গেছে। অন্তত আমাদের কোন কোন প্রযোজক-পরিচালক তাই মনে করতে শুরু করেছেন।"
-রফিকুজ্জামান, "আলমগীর কবির: এক কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন", *স্মরণিকা*, আজিজ মেহের, রফিকুজ্জামান ও বাবলু ভট্টাচার্য সম্পাদিত, (ঢাকা: বাংলাদেশ সৎচলচ্চিত্র ফ্রন্ট, ১৯৮৯), ফেব্রুয়ারি-মাচ, পৃ. ৪১।

বাংলাদেশের আবহমান রূপ প্রকাশের একটি চলচ্চিত্র হিসেবে গণ্য করে অগ্রসর হয়েছেন এর নির্মাণ আর অর্থায়নে। তবে মুক্তিযোদ্ধা এই প্রযোজকের চলচ্চিত্রটি নির্মাণ-সংকল্পের পেছনে যে প্রেরণা, সাহস ও উদ্যম কাজ করেছে, তার উৎস স্বাধীন বাংলাদেশ। তবে সেখানে কোনো রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদ বা বুর্জোয়া ভাবধারা কাজ করেনি। আর যদি তাই করতো, সেক্ষেত্রে তিনি কোনো মহান ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বা মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণে এগুতে পারতেন – সে চেষ্টা তিনি করেননি।

এই চলচ্চিত্রের নির্মাণ ব্যয় বাংলাদেশের তৎকালীন প্রচলিত ছবির নির্মাণ ব্যয় থেকে কিছুটা বেশি।[৭] তা সত্ত্বেও, হলিউড সৃষ্ট মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রের তুলনায় সে খরচ নিতান্তই নগণ্য। আর এ চলচ্চিত্র যে ব্যবসা করেনি, সে প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সে বিচারেও *তিতাস* মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রের প্রচলিত সংজ্ঞার ভেতরে পড়ে না বললেই চলে। এখানে উল্লেখ্য, চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অর্থ একটি বিশেষ চাহিদা হলেও, একটি চলচ্চিত্র যে মহাকাব্যিক শৈল্পিক শিখরে পৌঁছাতে পারে উপর্যুপরি অর্থ বিনিয়োগ ছাড়াও, তার অনন্য উদাহরণ *তিতাস*। এ কারণেই পশ্চিমা চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকগণ, যারা উপরে বর্ণিত এপিক চলচ্চিত্র অবলোকনে অভ্যস্ত, তারাও স্বীকার করে নেন *তিতাস*-এর মহাকাব্যিক গুণকে। *The Case for Global Film*-শিরোনামের একটি ব্লগ, যা একদল পশ্চিমা চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকদের দ্বারা পরিচালিত ও তাঁদের লেখা দিয়ে সম্পন্ন, সেখানে ঋত্বিকের এই চলচ্চিত্রকে Epic হিসেবে বিশেষায়িত করা হয়েছে (*The Case for Global Film*)।

মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রগুলো সাধারণত কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনির বীরোচিত চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে তাঁর জীবনের সাথে সংযোগ ঘটায় বিপুল বিস্তারী অসংখ্য ঘটনা আর সংখ্যাতীত চরিত্রের। অথচ *তীতাস*-এ নেই তেমন কোনো বীরোচিত ও মহান ব্যক্তিত্ব যিনি লোক-স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছেন কালের বিবর্তনে, ইতিহাসের চরিত্রের চাইতেও অধিক উজ্জ্বলতা নিয়ে। এই চলচ্চিত্রে আমরা দেখি তিতাস তীরবর্তী একদল নিম্নবর্গের মানুষের জীবন আখ্যান, যারা তিতাস নদীর মতোই অখ্যাত ও অবহেলিত। অকুলীন এই নদীর পরিচয় দিতে গিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাসে বলেন: "তিতাস সাধারণ একটি নদী মাত্র। কোনো ইতিহাসের কেতাবে, কোনো রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারাবাহিক বিবরণীতে এ নদীর নাম কেউ খুঁজিয়া পাইবে না। [...] কিন্তু তাই বলিয়া তার কি সত্যি কোনো ইতিহাস নাই" (২০১৬ [১৯৫৬]: ৪৫]? এ নদীরও ইতিহাস আছে আর সে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে আছে অবহেলিত মালোদের সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, প্রতিরোধ-বঞ্চনা, আচার-অর্চনা, ঐক্য-বিরোধ, উল্লাস আর বিপর্যয়ের নানা কাহিনি। অসংখ্য জীবন চিত্রের যোজনায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ যেমন এঁকেছেন তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাসের ক্যানভাস, তেমনি এই ক্যানভাসের সাধারণ মানুষদের দলিত জীবনকে চিরকালীন মহিমা দিলেন ঋত্বিক কুমার ঘটক তাঁর *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রে। এতে পাশ্চাত্যের প্রচলিত মহাকাব্য বা মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রের বিষয় বা দেবসম কেন্দ্রীয় চরিত্রের মাহাত্ম্য বা বাহুবলকে আমরা প্রত্যক্ষ করি না। তবে প্রাচ্যের মহাকাব্য *রামায়ণ* দেবতাকে দিয়েছে মনুষ্য চরিত্র আর "ঘরের সম্পর্কগুলি" হয়ে উঠেছে সেখানে চিরকালের (ঠাকুর, ১৪০২ বঙ্গাব্দ: ৭১৩)। ঋত্বিকের এই ছবিতেও আমরা দেখি মানুষ আর তাদের পারস্পরিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিস্তৃত ও চিরকালীন রূপ। তবে সেখানে নেই একক বা উচ্চবর্গের কোনো চরিত্রের প্রাধান্য কিংবা গুণগান। সুতরাং এপিকের চরিত্র বিচারে *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাস বা চলচ্চিত্র – দুটোতের

৭. *তিতাস*-এর প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান-এর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, এ চলচ্চিত্রের নির্মাণ ব্যায় মোট সাড়ে চার লাখ টাকা। তবে এর নির্মাণ ব্যয় আরও দু লাখ টাকা কমেও করা যেত। -খালেদ হায়দার ও বাকির আবদুল্লাহ, "তিতাসের প্রযোজকের সাথে কিছুক্ষণ"। সাজেদুল আউয়াল সম্পাদিত *ঋত্বিকমঙ্গল*-এ সংকলিত। (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ৪০ (পাদটীকা অংশে উদ্ধৃত)।

অস্বীকৃত হয়েছে প্রচলিত মহাকাব্যের রীতি ও ডিসকোর্স। তা সত্ত্বেও নির্মাণ শৈলী, বিষয়ের বিস্তার, সমষ্টিগত জীবনভঙ্গি ও দর্শনের প্রকাশ, গল্প বলার ঢঙ, সংকেত সৃষ্টি, প্রত্নরূপ সৃজন, আচার-উৎসবের চিত্রায়ণ আর আবেগ নির্মাণের কৌশলসহ ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্যের চিরন্তন উপস্থিতিতে *তিতাস একটি নদীর নাম* হয়ে উঠেছে ব্রাত্যজনের এক চলচ্চিত্রিক মহাকাব্য।

চিত্র ৪. *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে প্রবহমান তিতাসের রূপ ও সৌন্দর্য।

চলচ্চিত্রে কাহিনির ঘটনাক্রম

এ চলচ্চিত্রের কাহিনি আর্বতিত হয়েছে তিতাস নদী পাড়ের মালো সম্প্রদায়ের জীবন আর জীবনের বিপর্যয়, সংগ্রাম আর স্বপ্নকে ঘিরে। তিতাস ও তিতাসের পাড়ের গোষ্ঠীবদ্ধ মালোদের জীবন – দুটোই এগিয়েছে এ চলচ্চিত্রে সমান গতিতে ও সমান্তরালভাবে। এখানে আছে অসংখ্য চরিত্র এবং তাদের জীবনের নানা পর্যায়। বাসন্তী, কিশোর, সুবোল, রামপ্রসাদ, রাজার ঝি, অনন্ত, তিলক চাঁদ, মুংলি, কাদির মিয়া, বনমালী, উদয়তারা, ছাদির, মাগন সরকার, কালাবরণের মাসহ অসংখ্য চরিত্রের জীবন বৃত্তকে ঘিরে তিতাসের প্রবাহ আর শুষ্ক হওয়া। মহাকাব্যের মতো এসকল চরিত্রের জীবনের ঘটনা এগিয়েছে নানা পর্বে।

চলচ্চিত্রের শুরুতে দেখি কিশোরী বাসন্তী মাঘমণ্ডলের দিন ছৌয়ারি ঘুরায়। সেই ছৌয়ারিতে নাড়ু আর খই ছড়িয়ে দেয় বাসন্তীর মা। আর সে খই আর নাড়ু নিয়ে কাড়াকাড়ি করে কিশোর আর সুবল। বাসন্তীর চেয়ে বয়সে কিছু বড় এরা দুজন বাসন্তীর প্রতিবেশী ও তার খেলার সাথী। কিশোর আর সুবোল যায় উজানী নগরের খলাতে মাছ ধরতে। কিশোরী বাসন্তী নদী তীরে নৌকার উপর বসে আনমনে যেন তাদেরই প্রতীক্ষা করে।

কিশোর ও সুবোল দূর গাঁয়ে যখন মাছ ধরতে যায়, তখন দেখি সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে। তারা এখন যুবক। সঙ্গে আছে প্রবীণ তীলক চাঁদ। সেই গাঁয়ে দোল পূর্ণির্মার উৎসব দেখতে যায় তারা। সেখানে পাশের গাঁয়ের লোকরা আক্রমণ করে। এই সংঘর্ষের সময় একটি মূর্ছা যাওয়া তরুণীকে কোলে তুলে নেয় কিশোর, সাহায্যের উদ্দেশ্যে। পরে, মোড়লের নির্দেশে এই তরুণী, রাজার ঝি-এর সাথে কিশোরের মালা বদল হয়। তারা বাসর সয্যায় মিলিত হয়। নতুন বউ নিয়ে কিশোর, সুবোল আর তিলক চাঁদ নিজ গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয় তাদের নৌকায়। রাতে ডাকাতদল চুপিসারে এসে নৌকা থেকে বউকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তবে মেয়েটি সে সময় পানিতে ঝাঁপ দেয়। ডাকাত দল পালিয়ে যায়। বউ হারিয়ে কিশোর উন্মাদ হয়ে যায়। এদিকে বউটি ভাসতে ভাসতে অজ্ঞান অবস্থায় নদী তীরে এসে ঠেকে। তাকে উদ্ধার করে দুই ভাই গৌরাঙ্গসুন্দর আর নিত্যানন্দ।

এর মাঝে বাসন্তীও বড় হয়। তবে যৌবনবতী বাসন্তী এখন বিধবা। সুবলার সাথে বিয়ে হয়েছিল তার, যদিও ছোটবেলা থেকে কিশোরের সাথে বিয়ে ঠিক ছিল তার। সেই কিশোর এখন উন্মাদ। আর বাসন্তীর স্বামী সুবল মরেছে বউভাতের পরের দিন। তিতাস পাড়ের প্রকৃতি এখন বাসন্তীর সঙ্গী – সাথে আছে মায়ের গঞ্জনা বিধবা হওয়ার কারণে।

রাজার ঝি তার সন্তান অনন্তকে নিয়ে এই গ্রামে আসে নিজ স্বামীর খোঁজে। ডাকাতের হাত থেকে বাঁচার জন্য যখন সে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল তখন গৌরাঙ্গসুন্দর আর নিত্যানন্দ তাকে উদ্ধার করেছিল। তাদের আশ্রয়ে সে ছিল প্রায় নয়-দশ বছর। সেখানেই তার আর কিশোরের সন্তান অনন্তের জন্ম হয়। এতদিন সে তার স্বামীর খোঁজ করেনি। এখন এসেছে, কারণ সন্তান বড় হচ্ছে। অনন্তের জন্য প্রয়োজন পিতার পরিচয়। তবে রাজার ঝি তার স্বামীর নামটিও জানে না, জানে কেবল তার স্বামীর গ্রামের নাম।

যেদিন রাজার ঝি-এর আগমন এই গ্রামে, সেদিন নদীর পাড়ে আমরা দেখি জটাধারী উন্মাদ কিশোরকে। তাকে স্নান করাতে নিয়ে যায় তার বৃদ্ধ বাবা-মা। রাজার ঝি কিশোরকে দেখে, কিন্তু চিনতে পারে না। এই গাঁয়ে তার আশ্রয় হয়। বাসন্তী রাজার ঝিঁকে নানা ভাবে সাহায্য করে। সুতা তৈরির টাকু, পিড়া ইত্যাদি দেয় বাসন্তী রাজার ঝিকে, যাতে সে সুতা কেটে জীবন চালাতে পারে। এর মাঝে গ্রামে বিচার বসে অনন্তের মাকে সমাজে গ্রহণের বিষয়ে। বাসন্তীর সই মুংলী আওয়াজ তোলে রাজার ঝি-এর পক্ষে। অনেকের কুকীর্তির প্রসঙ্গ তুলে সে বলে তার সমাজ হলো মোট তিন ঘরের। গ্রামের মাতবর রামপ্রসাদ সিদ্ধান্ত দেয়, অনন্তের মাকে নিয়ে মুংলীর সমাজ হবে চার ঘরের। এক অর্থে, মালু সমাজে তাকে গ্রহণ করা হয়।

এর মাঝে কালী পূজার সময় ঘনিয়ে এলে বাসন্তী রাজার ঝিকে নিয়ে কিশোরদের বাড়ি যায়, পিঠা বানানোর জন্য। সে রাতে রাজার ঝি কিশোরকে পিঠা খেতে দিলে পাগল কিশোর দা নিয়ে তার দিকে তেড়ে আসে। আবার থেমে যায় সে। তারপর পিঠা নিয়ে হারিয়ে যায় রাতের আঁধারে। এর মাঝে রাজার ঝিকে নিয়মিত চাল-শব্জি আর নানা জিনিস দিয়ে বাসন্তী সাহায্য করতে থাকে। দুজনার বন্ধুত্ব হয়। রাজার ঝি বাসন্তীর কাছ থেকে শুনে কিশোরের পাগল হওয়ার বৃত্তান্ত। হোলির দিন পাগল কিশোরকে নিয়ে যখন কিশোরের মা নদীতে যায় স্নান করানোর জন্য, তখন রাজার ঝিও এগিয়ে আসে তাদের সাহায্যে। নদীর জলে নেমে দুজন দুজনকে রঙ মাখিয়ে দেয়। পাগল কিশোর রাজার ঝিকে হঠাৎ কোলে তুলে নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে দৌড়ে পালায়। তার পিছু নেয় গাঁয়ের ছেলেরা। তারা কিশোরকে বেদম প্রহার করে পালিয়ে যায়। রাজার ঝিও মূর্ছা যায়। জ্ঞান ফিরে এলে রাজার ঝি গড়াতে গড়াতে আচল দিয়ে তিতাসের পানি এনে অচেতন কিশোরের মুখে দেয়। তার জ্ঞান ফিরে আসে। সে রাজার ঝিকে 'বৌ' বলে ডেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। রাজার ঝি-এর জীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে খানিকক্ষণ বাদে – নদীর তীরে।

অনাথ অনন্তকে মাতৃস্নেহে কোলে তুলে নেয় বাসন্তী। অনন্ত যেন দেখে, তার মা দেবী ভগবতীর বেশে ঘাটে আসে, তার সাথে কথা বলতে চায়। বাসন্তীর মাতৃস্নেহ বালকটির প্রতি আরও বেড়ে যায়। সে ভাবে মৃতা মা এসে অনন্তকে নিয়ে যেতে যায় তার কাছে। পরের সন্তানের প্রতি বাসন্তীর এই অপত্য পুত্রস্নেহ সহ্য হয় না বাসন্তীর মায়ের। এই নিয়ে মা-মেয়েতে মারামারি হয়। এক সময় অনন্তকে তাড়িয়ে দেয় বাসন্তি। অনন্ত চলে যায় উদয়তারার সাথে তার বাপের বাড়িতে।

বাসন্তীদের গ্রামে ঋণদান সমিতির ফিশারি শাখার ম্যানেজারের আনাগোনা শুরু হয় ঋণের টাকা আদায়ের জন্য। বাসন্তীর দিকে তার নজর পড়ে। বাসন্তী তাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে মুংলী আর কালাবরণের মায়ের সাহায্যে বেদম প্রহার করে তিতাসের পানিতে ফেলে দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় বিধু মাতব্বর ও তার দল। এই দলে মালো পাড়ারও একজন ভিড়ে যায়। তারা ফন্দি আঁটতে থাকে মালুদের বিরুদ্ধে – যাত্রা দলের যাত্রা দিয়ে তাদের মোহগ্রস্ত করবে, আর টাকা দিয়ে ফেলবে ঋণের জালে। এরপর বিধু মাতব্বর আদালতে যায়, মাগন সরকারের কাছে সাহায্য চায় মামলা করার জন্য।

এর মাঝে, আমার দেখি ভাগচাষী কাদির মিয়ার উপকাহিনি। সে দয়ালু লোক। গাঁয়ের হাটে আলু বিক্রির সময় অনন্তকে একবার কিছু কাটা আলু দিয়ে সাহায্য করেছিল। ছেলে ছাদির আর ছাদিরের পরিবার নিয়ে তার সুখের সংসার। উকিল মাগন সরকার তার নামে মিথ্যা মামলা দেয়। তার বেয়াই মুহুরি তাকে সাহায্য করতে চায়। কিন্তু সে এসব কিছু না করেই মুখোমুখি হয় মাগনের। তার কাছ থেকে নেওয়া ঋণের টাকা শোধ করার পরও সে মামলা দিয়েছে। সে মাগনকে বলে, মামলা মোকদ্দমা কিছুই সে করবে না, জমি জমা বিক্রি করে শোধ করবে তার মিথ্যে মামলার টাকা। তবুও যেন সে ভালো হয়ে যায়। এরপর দেখি, মাগন আত্ম-অনুশোচনায় গাছ থেকে পড়ে আত্মহত্যা করে।

এর মাঝে ছাদির নৌকা বাইচের জন্য নাও তৈরি করে। যদিও কাদির ভাবে এসব অযথা বাহুল্য। ছাদিরের কাছে নৌকা বাইচে জেতা মানে গ্রামের জন্য এক সম্মানের বিষয়। নৌকা বাইচের দিন ঘাটে জমায়েত হয় অসংখ্য লোক। উদয়তারা অনন্তকে নিয়ে এসেছে নৌকা বাইচ দেখতে। বাসন্তীও এসেছে ঘাটে। অনন্ত বাসন্তীকে দেখে ডেকে ওঠে 'মাসী, মাসী' বলে। বাসন্তীও ছুটে গিয়ে কোলে জড়ায় অনন্তকে। কিন্তু উদয় তারাকে দেখে অনন্ত তার মাসীকে বলে তাকে ছেড়ে দিতে। বাসন্তী অভিমানে অনন্তকে চড় মারে। উদয় তারাও হিংস্র হয়ে বাসন্তীর দিকে তেড়ে আসে। নৌকা বাইচ আর মানুষের উল্লাসের শব্দের নীচে চাপা পড়ে বাসন্তীর প্রহৃত হবার শব্দ আর আর্তচিৎকার।

বাসন্তীকে সেবা দিয়ে সারিয়ে তোলে তার মা। এদিকে মুংলী এসে জানায় যে, বাজারে লোকের মুখে মুখে, বিশেষ করে যারা তবলা বাজায় তাদের মুখে বাসন্তীকে নিয়ে নানা কথা রটেছে। তারা উৎসুক জানতে, বাসন্তী কেন দরজা বন্ধ করে বাড়িতে আছে? বিচার বসে গ্রামে। অভিযোগ – যাত্রার লোকেরা গাঁয়ের মেয়ে-ছেলেদের কাপড় ধরে টানে। এর একটা বিহিত করা চাই। দয়ালচান বিচারের সভা থেকে উঠে যেতে চায়। বোঝা যায় মালুদের একতায় ভাঙন ধরেছে। এরপর দেখি, যাত্রাদলের এক নট অশ্বিনী পথে বাসন্তীকে পেয়ে উত্যক্ত করে। বাসন্তীও এক পর্যায়ে তার দিকে তেড়ে যায়, সে পালিয়ে যায়।

এদিকে তিতাস পানি শূন্য হতে থাকে। এরপর লোন কোম্পানির বিধু মাতব্বর তার লোকজন আর অশ্বিনীসহ বাসন্তীর বাবার কাছ থেকে ঋণ আদায়ের নামে তাকে মেরে টাকা আদায় করে। জব্দ করে অন্যান্য জিনিস। এক পর্যায়ে তারা মালো পাড়ায় আগুন লাগিয়ে দেয়। মালোদের এত অভাব দেখা দেয় যে, মালো বাড়ির অনেক বউরা বাধ্য হয়ে ভিক্ষায় নামে।

তিতাসের বুক চর জাগে। চাষীদের সাথে চর দখল নিয়ে মালোদের সংঘর্ষ হয়। মালোদের সাথে যোগ দেয় কিছু ভাগচাষী। লড়াইয়ে পরাজয় হয় নিম্নবর্গের মালোদের। রুগ্ন, অভুক্ত-তৃষ্ণার্ত বাসন্তী এক ফোঁটা পানির আসায় এগিয়ে চলে তিতাসের দিকে। চারিদিকে ধু ধু চর। কোথাও তিতাসের পানির দেখা নেই। এক পর্যায়ে বালি খুঁড়তে থাকে বাসন্তী। বালির তলায় মেলে একটু পানির সন্ধান।

দুর্বল বাসন্তী ঘটিতে পানি ভরে মুখের দিকে এগিয়ে নিতেই হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে ঘটি পানিসহ। মৃত্যুমুখে ঘোলা চোখে বাসন্তী দেখে, দূর থেকে একটি শিশু উদাম গায়ে খেলনা বাঁশি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে। তার দৌড়ানোর দুপথে সবুজ ধান ক্ষেত। মৃতপ্রায় বাসন্তীর চোখে জাগে আশা ও আনন্দের ঝিলিক। আর এখানে স্থির হয়ে যায় এই চলচ্চিত্রের শেষ ফ্রেম।

কাহিনির বৃত্তাকার চলনে অসংখ্য জীবনবৃত্ত: ঋত্বিকের চিহ্ন নির্মাণে "বৃত্ত"

তিতাস একটি নদীর নাম চলচ্চিত্র একক জীবনকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র নয়। সংখ্যাতীত জীবনবৃত্ত যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁতির মতো এ চলচ্চিত্রে ছড়িয়ে আছে। আর এ সকল অসংখ্য পুঁতির মিলে এই চলচ্চিত্রের কাহিনির অখণ্ড মালাটির গ্রন্থন। তাই এতে কাহিনির যে চলন তা বৃত্তাকার ও নানা পর্বে পরিব্যাপ্ত। বৃত্তাকার কাহিনির চলনে মালো জীবনের ভাঙা-গড়া সত্যিকার অর্থে নির্দিষ্ট কোনো পরিসমাপ্তিতে এসে পৌঁছে না, যদিও চলচ্চিত্রের শেষ দিকে আমরা দেখি, শুষ্ক তিতাস আর পরাজিত মালোরা প্রায় ধ্বংসের পথে। এতে মালো জীবনের নিঃশেষ হয়ে যাওয়াকেই ঋত্বিক ঘটক শুধু ইঙ্গিত করেননি। নতুন ধান গাছের ফাঁকে শিশুর ছুটে চলার মাঝে আবার সভ্যতার চলন ও জীবন বৃত্তের ক্রমাগত ঘূর্ণনেরই যেন আভাস পাই। এ চলচ্চিত্রে ঋত্বিকের চিহ্ন নির্মাণ কৌশলে 'বৃত্ত' এসেছে বৃহত্তর অর্থের দ্যোতনা নিয়ে। আবার তা গোষ্ঠীবদ্ধ মালো সম্প্রদায়ের একতা ও আত্মরক্ষার দিকটিকেও ইঙ্গিত করে।

চিত্র ৫. *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রের টাইটেল দৃশ্যের সূচনা ফ্রেম। কিছুটা বৃত্তকারে বাঁক নেওয়া তিতাসের একটি শীর্ণা রূপ।

চলচ্চিত্রের টাইটেল দৃশ্যের শুরু হয় শুকিয়ে যাওয়া তিতাসের প্রায় বৃত্তাকারে বাঁক নেয়া একটি লঙ (দীর্ঘ) ও স্থির শটের ভেতর দিয়ে (চিত্র ৫)। আপাত দৃষ্টিতে দৃশ্যমান শান্ত-স্নিগ্ধ এই শট আমাদের ইঙ্গিত দেয় একটি নদীর জীবনবৃত্ত ও এর পরিণতিকে। আর এই নদীর জীবনবৃত্তের সাথে জুড়ে আছে সংখ্যাতীত মানুষেরও জীবনবৃত্ত। তিতাসের এই শটের ওপরই ভেসে ওঠে চলচ্চিত্রের শিরোনাম: *তিতাস একটি নদীর নাম*। শটটি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। তারপরেই দেখি সূচনা কুশলী লিপি (opening credit line)। এই অংশে শটের পরিবর্তনে দেখি তিতাসের নানা রূপ। কখনও নৌকা বেয়ে দূর গাঙে চলেছে মাঝি, কখনও বর্ষায় ভেজা তিতাস। আর ফাঁকে ফাঁকে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন সময়ের দৃশ্যের কোলাজ। তার ওপরে থেমে থেমে ফুটে ওঠে কুশলীদের পরিচয় লিপি। এই শটগুলোর বিপরীতে শ্রুতিগোচর হয় ধীরাজ উদ্দীন ফকিরের গাওয়া একটি লালন গীতি:

ওরে নৌকার ওপর গঙ্গা বোঝাই
তারা সুখ নায় বেয়ে যায়
[তোমার] আজব লীলে।
অভয় অতল গঙ্গা সে যে,
সংখ্যা বিচার নাওনা যারে।[৮]
আরে পলকে পাহাড় ভাসে
পলকে লুকায়, আজব লীলে।।
ফুল ধইরাছে অচিন ডালে
ফল ধইরাছে গঙ্গা জলে
আরে ফলে ফুলে কত রঙ খেলে
ও তার ফলে বারতা পায়,
[তোমার] আজব লীলে।
মীন যাবে যেদিন গঙ্গা জলে
দেহ ঘুইরা দেখলি নারে,
ফকির লালন বলে জল শুকাইলে
সেদিন মীন যাবে হাওয়ায়,
[তোমার] আজব লীলে।
লীলে দেখে লাগে ভয়,
তোমার আজব লীলে।। ["সূচনা সংগীত"। *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩)]।

গানটির ভেতরেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে অথৈ জল ও জল শূন্যতা নিয়ে একটি নদীর জীবনবৃত্তের ইঙ্গিত। আর এই ভাঙা-গড়া যেন ঈশ্বরের এক আজব খেলা। ঈশ্বর তথা প্রকৃতি যেন নদী ও নদী পাড়ের মালো জীবন নিয়ে অবিরত খেলছে। নদী পাড়ের মানুষগুলো যেন কখনও নদীর মতো পূর্ণ, আবার কখনও শীর্ণ নদীরটির মতো শুষ্ক ও রিক্ত। চলচ্চিত্রের শুরুতে এই লালন গীতির মধ্য দিয়ে ভাঙা-গড়াময় এতদ্‌অঞ্চলের জীবন-বৃত্তের যে রূপের সাথে ঋত্বিক দর্শককে পরিচয় করিয়ে দেন – তাতে ফুটে ওঠে আবহমান বাংলার চিরায়ত এক রূপ। এই গান চলতে চলতেই ক্রেডিট লাইনের ওপর এই চলচ্চিত্রের উৎসর্গ বাণীটি দেখি: "এই চিত্র শাশ্বত বাংলার, আবহমান সূত্রের ধারক বাংলার খেটে খাওয়া অখ্যাত জনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত।"[৯] সবমিলিয়ে, শিরোনাম দৃশ্যে সংগীতের সুর, আবেগ, গায়কী, আর তার চিত্রায়ণ ভঙ্গি চলচ্চিত্রের মূল সুরটির সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় শুরুতেই।

---

৮. এই চরণ এরকমও হতে পারে: *সংক্ষেপে তা নাওনা বুঝে।*

৯. "শিরোনাম দৃশ্যে উৎসর্গ বাণী"। ঋত্বিক কুমার ঘটক (সংগীত ভাবনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা), *তিতাস একটি নদীর নাম*, (পূর্বপ্রাণ কথাচিত্র, ১৯৭৩), [চলচ্চিত্র]।

এরপর আরও একটি বৃত্তের চিহ্ন দিয়ে হয় এই চলচ্চিত্রের প্রথম দৃশ্যের উন্মোচন। কিশোরী বাসন্তী মাঘমণ্ডলের ব্রতে চৌয়ারি ঘুরাচ্ছে। চৌয়ারির এই ঘূর্ণনেও দেখি একটি বৃত্তের উদ্ভব। উপন্যাসে এই চৌয়ারির বর্ণনায় দেখিঃ "আলিপনার মাঝখানে বাসন্তী ছাতা মাথায় দিয়া একখানি চৌকিতে বসিল। ছাতাখানা সে আস্তে আস্তে ঘুরাইতে লাগিল এবং তার মা ছাতার উপর খই আর নাড়ু ঢালিয়া দিতে লাগিল" (মল্লবর্মণ, ২০১৬ [মূল উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬ সাল]: ৫০)। তার মানে উপন্যাসে বাসন্তী চৌয়ারি খানা তার মাথার উপরে রেখে ঘুরাচ্ছিল। কিন্তু চলচ্চিত্রে ঋত্বিক ছাতা খানাকে আড়াআড়ি ভাবে বাসন্তীর হাতে রেখে ক্যামেরার দিকে তাক করে ঘুরালেন, যাতে চৌয়ারির নকশা ও বৃত্তাকার ঘূর্ণন স্পষ্টতা পায় (চিত্র ৬)। আর এই ঘূর্ণনে বাসন্তী তথা মালোদের জীবন প্রবাহের বৃত্তও বাঙ্ময় হয়ে উঠে। শুরুর এই পর্বে অর্থাৎ বাসন্তীর কিশোরী বেলার আর একটি দৃশ্যে ভাঙা-গড়া নিয়ে তিতাস সংলগ্ন মালোদের জীবনবৃত্তের উল্লেখ পাই রামপ্রসাদের সংলাপেঃ

> এই রকমই হয় মা, এই সব আছে, এই নাই, এই বাত্তি জ্বইলা উঠে, এই নিব্বা যায়, হদিস মেলে না। এই কাইল তুই [বাসন্তীকে] ছোড আছিলি, আইজ বড় হইছস। এই তিতাস চলে, কাইল হয়ত দেখুম শুকনা, খটখইট্টা, ড্যাঙ্গা। মরনকালে যে জল মুখে না দিলে পরানডা তক বাইর হয় না। একদিন হয়ত দেখুম তিতাসে সেই জলটুকুও নাই (ঘটক, ১৯৭৩)।

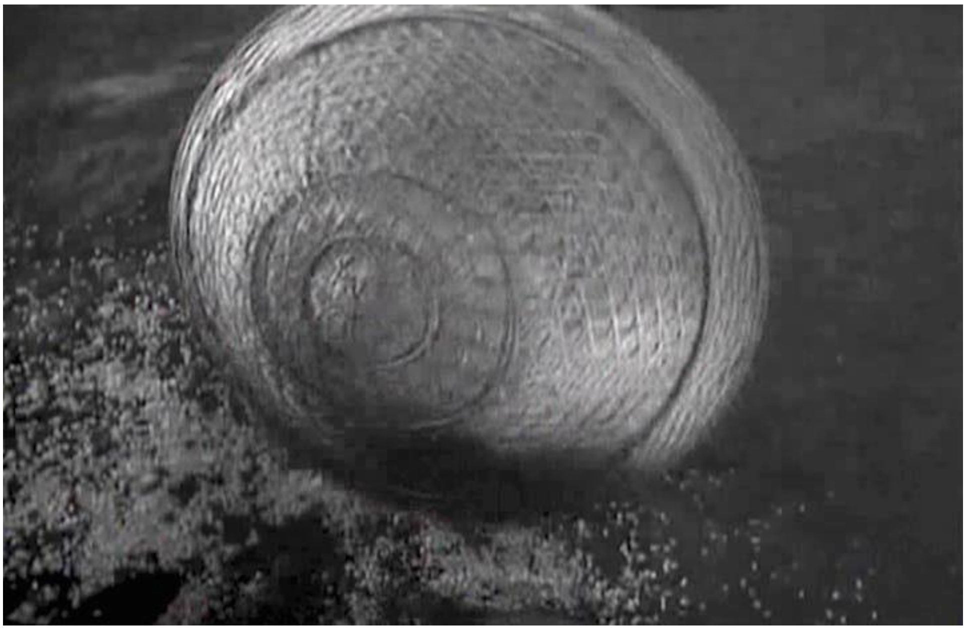

চিত্র ৬. *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রের সূচনা দৃশ্যে, বৃত্তাকার চৌয়ারির ঘূর্ণন যেন জীবনবৃত্তের ঘূর্ণনকে নির্দেশ করে।

চলচ্চিত্রের শেষেও চর দখল নিয়ে মালো আর চাষিদের লাঠালাঠিতে রামপ্রসাদের মৃত্যুর পর আমরা দেখি বাসন্তীর স্মৃতিতে ভেসে ওঠে রামপ্রসাদের এই সংলাপ। উপন্যাসে এই সংলাপের উল্লেখ নাই। এটি ঋত্বিকের নিজস্ব সংযোজন – তিতাস পারের মালোদের জীবনবৃত্তের ইঙ্গিত রচনায়। একটি জনগোষ্ঠীর জীবনের গ্রন্থনায় এ চলচ্চিত্রে যেমন আছে একটি বৃহৎ বৃত্ত, তেমনি এই বৃহৎ বৃত্তের

অবকাঠামোটি তৈরি হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বৃত্তের যোজনায়। বাসন্তী, রাজার ঝি, অনন্ত, কিশোর, সুবোল, মুংলী, রামপ্রসাদ, কাদির মিয়া, বাসন্তির মা, উদয় তারা, কালুর মা, রাম কেশব, বনমালী, মোহন – ইত্যাদি অসংখ্য চরিত্র এই চলচ্চিত্রে হাজির অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন বৃত্ত নিয়ে। চরিত্রগুলো কখনও সোভিয়েত বিপ্লবোত্তর চলচ্চিত্রে দৃশ্যমান 'টাইপেজ (typage)'[১০] চরিত্রের প্রণোদনায় নিম্নবর্গ মালো জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য সমেত উপস্থিত। আবার এদের বলা যায়, নদী সংলগ্ন মানুষের প্রত্নরূপের প্রতিনিধি। এ কারণে এই অসংখ্য চরিত্রের জীবন বৃত্তের মধ্য দিয়ে আমার পরিচিত হই তিতাস পাড়ের মালো জীবনের আচার-উৎসব, বিশ্বাস, তাদের সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক, আয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আর এই বিপর্যয় থেকে উপার্যনের বিপর্যয়, মহাজন ও ঋণদাতাদের নানা চক্রান্তে পড়ে তাদের নিঃস্ব হওয়াসহ ইত্যাদি প্রসঙ্গের সাথে।

তিতাস পাড়ের মানুষের "একটা জীবন-প্রণালী, মানুষের এক বিচিত্র জীবন প্রবাহ" (কায়সার, ২০০১: ২০৮) চলচ্চিত্রে অঙ্কন করতে গিয়ে ঋত্বিক যেমন অদ্বৈত মল্লবর্মণ সৃষ্ট কাহিনির প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন, তেমনি সেখানে প্রয়োগ করেছেন নিজ শিল্পভাবনা। এ কারণেই উপন্যাসের শেষে মালোদের পরাজয় দৃশ্যমান হলেও, সেখানে পরাজয় বা ক্ষয়ের মাঝেই জেগে উঠতে দেখি সভ্যতার নতুন চলন। এ প্রসঙ্গে ঋত্বিকের উক্তি:

> I followed the story of Adwaita Babu to some extent. The film appears to be very delightful. Adwaita babu has done the natural. He ends it in ruins; everything is shattered down. My hint at the end is at the new order, the new life that is struggling to be born (cited in Rajadhyaksha and Gangar, 1970: 100).

সুতরাং লক্ষণীয় মহাকাব্যের মতোই এ চলচ্চিত্রের পরিসমাপ্তিও হয়েছে একটি ধনাত্মক আবহ নির্মাণের মধ্য দিয়ে। আর এই ধনাত্মক আবহ সভ্যতার প্রবহমানতার চিরন্তন সত্যটিকে নির্দেশ করে। ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু হতে পারে কিন্তু সভ্যতা বা মানবিকতার মৃত্যু নেই, তারা প্রবহমান। নদীও গতিশীল। তার গতিপথ আর রূপের পরিবর্তন হতে পারে। প্রকৃতির খেয়ালে এই নদীর বুকে জেগে উঠতে পারে চর। কিন্তু সে চরের বুকে আবারও জেগে উঠবে জীবন ও জীবিকা। এভাবে নদীর প্রবহমানতায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনবৃত্তের মহাকাব্যিক ইতিবৃত্তই নির্মিত হয়েছে *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রে।

নদী ও নারীর সমান্তরাল জীবনের মহাকাব্যিক রূপ

তিতাস চলচ্চিত্রের বৃহৎ কাহিনিবৃত্তের কেন্দ্রে আছে তিতাস ও বাসন্তী। নদী ও নারীর জীবনবৃত্তের ঐক্য নদীমাতৃক বাংলার এক চিরকালীন রূপ। দুটি সত্তাই নিজেদের উজাড় করে পূরণ করে সমাজ-সংসারের নানা প্রয়োজন। অথচ দুজনকেই বিপন্ন করেছে মানুষ। তিতাস ও বাসন্তীর সমান্তরাল জীবনেও ঋত্বিক তুলে আনেন ভাঙা-গড়ার নানা পর্যায়। চলচ্চিত্রের প্রায় শেষ দিকে বাসন্তীর সংলাপের মাঝে ফুটে ওঠে তিতাস পাড়ের এই নারীর জীবন বৃত্তের নানা পর্যায়: "বাসন্তী আছিলাম ছোডকালে, যহন মাঘমাসে বেউড়া ভাসাইতাম। তারপরে হইয়া গেলাম কার বউ। তার পরে রাড়ী। মাঝখানে অইয়া গেলাম অনন্তের মাসি। অহন অইয়া গেলাম বাসন্তী" (ঘটক, ১৯৭৩)। যৌবনে বাসন্তী স্বামীকে হারিয়ে তিতাস

---

১০. সোভিয়েত "টাইপেজ" চরিত্রগুলো সাধারণ সর্বহারা মানুষের শ্রেণিচরিত্র ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে চলচ্চিত্রে হাজির করতো। সেখানে কোনো বিখ্যাত তারকা খ্যাতি সম্পন্ন অভিনেতা/অভিনেত্রীদের খ্যাতিকে কাজে লাগানোর বিষয়টি একেবারেই বিবেচিত হতো না।

-Douglas Gomery, and Clara Pafort-Overduin. *Movie history*, (Abingdon: Routledge, 2011), p. 117.

আর তিতাস পাড়ের প্রকৃতিকে করেছিল তার নিত্যসঙ্গী। তিতাসের পানি যেন আয়না হয়ে স্বামী হারা এই নারীর সৌন্দর্যের স্বীকৃতি দিত। মা-এর সংলাপে শুনি বাসন্তীর তিতাস-মুগ্ধতার প্রতি তার ক্ষেদ: "তিতাসের পানিতে কি আছে? নিজের মুহের ছিরি কি দেহস ওইহানে (১৯৭৩)?" তিতাস নদীর মতো এক সময় অনন্তও হয়ে ওঠে বাসন্তীর স্নেহ, ভালোবাসা আর মনোযোগের একজন। অনন্ত যখন উদয়তারার সাথে চলে যায় বাসন্তীকে ছেড়ে, তখন এই তিতাসের পাড়ে বৃষ্টির জলেই যেন বাসন্তীর মাতৃত্বের বেদনা শান্তি খোঁজে (চিত্র ৭)।

আবার তিতাস পাড়ের মালুদের দুঃখে-কষ্টে কিংবা এদের প্রতি নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাসন্তীর সৌন্দর্য জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের আভায়। চলচ্চিত্রের শেষ দিকে তিতাস প্রায় পানি শূন্য। উদয়তারার সাথে বাসন্তীর হঠাৎ সাক্ষাতে বাসন্তী জানতে পারে অনন্ত উদয়তারাকে ছেড়ে শহরে গেছে – ভদ্রলোকদের সাথে তার বাস এখন। তখনও বাসন্তীর সংলাপে এসেছে তিতাসের কথা: "না, লো, আমি ভাবি এই তিতাসের কথা। অনন্ত যেমন একটা নাম আমার কাছে, তিতাসও তেমন একটা নাম অইয়া গেল। নামটা রইল, নদীটা মরছে।" নদীর মৃত্যু আর বাসন্তীর মৃত্যু যেন সমান্তরালে এগিয়েছে। তাই চলচ্চিত্রের শেষে দেখি রিক্ত তিতাসের বুকেই এলিয়ে পড়ছে বাসন্তী।

চিত্র ৭. উদয়তারার সাথে অনন্ত চলে যাবার পর, বাসন্তীর মাতৃত্বের বেদনা যেন বৃষ্টির সাথে ঝরে পড়ে তিতাসের বুকে।

এ চলচ্চিত্রের আর এক কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র রাজার ঝি। তার জীবনেও দেখি নদীর আছড়ে পড়া ঢেউ। নদীর বুকেই সে কখনও আশ্রয় হারিয়েছে, পড়েছে ডাকাতের হামলার মুখে। ডাকাতের হাত হতে বাঁচার জন্য নদীর বুকেই তার ঝাঁপ দেওয়া। নদীর স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে পাড়ে ঠেকিয়েছে, যেখানে দুই বৃদ্ধের সহৃদয় হাত তাকে উদ্ধার করেছে। আবার নদী তীরেই সে ফিরে পেয়েছে তার হারানো স্বামী কিশোরকে। নদীর পাড়েই স্মৃতিভ্রষ্ট কিশোর আর তার আবির মাখামাখি। হোলির দিনে

উন্মাদ কিশোরকে নিয়ে যখন তার মা নদীতে স্নান করাতে যায় তখন রাজার ঝি এগিয়ে আসে ওদের সাহায্যের জন্য। স্নানের সময় পাগল কিশোর তার মুখে আবির মাখিয়ে দেয়। বিনিময়ে রাজার ঝিও কিশোরের মুখে আবির মাখে। এ যেন রাধা-কৃষ্ণের মিলনের মুহূর্ত। দূর থেকে ভেসে আসে কীর্তনের সুর: *আহা কিবা অপরূপ, কিবা শোভা মনোহর, রাধা-কৃষ্ণের মিলন হইল দেখিতে সুন্দর* (ঘটক, ১৯৭৩)। নদীর কিনার ধরে পাগল কিশোর তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ছুটে – কিছু সময়ের জন্য রাজার ঝি মূর্ছা যায়। এই নদীর কিনারেই লোকজনের মার খেয়ে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ে কিশোর। রাজার ঝিও নদীর কূলকেই যেন বেছে নেয় শেষ সয্যার স্থান হিসেবে। স্বামীর মুখে তিতাসের পানি দেওয়ার পর তার সম্মুখেই মৃত্যু ঘটে কিশোরের। এরপর গড়াতে গড়াতে সে তিতাস নদীর পাড় ঘেষা পানিতে এসে পড়ে। সেখানে মৃত্যু হয় তার। উপন্যাসে কিশোর আর রাজার ঝি-এর মৃত্যু কিন্তু নদীর পাড়ে হয়নি। সেখানে রাজার ঝি-এর মৃত্যু হয় জ্বর আক্রান্ত হয়ে কিশোরের মৃত্যুর চারদিন পর, বাড়িতে। আর কিশোর মরেছিল উঠানের এক কোণে। চলচ্চিত্রে দুজনেরই অন্তিম যাত্রা সূচিত হয় তিতাসের পাড়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে। ওদের মৃত্যুর পর একটি ফ্রেমে তিতাসকে প্রেক্ষাপটে রেখে কিশোর আর রাজার ঝি-এর মৃত দেহের যে আনুভূমিক বিন্যাস, তাতে ইঙ্গিত রচিত হয় নদীসংলগ্ন জীবনের অন্তিম

শয্যার দৃশ্যময় অভিঘাতের মিল নদীটির সমান্তরাল চলনের সাথে।

চিত্র ৮. তিতাসের পানিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে রাজার ঝি।

নদী এ চলচ্চিত্রে জন্ম-মৃত্যু তথা জীবন বৃত্তের এক অমোঘ উৎস হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। আর এখানে নারী জীবনের বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে নদীর সমান্তরালে। এভাবে নদীর প্রবহমানতার সমান্তরালে নারীর জীবনপ্রবাহের এই গতিকে যেভাবে চিত্রিত করেন ঋত্বিক এই চলচ্চিত্রে তাতে স্পন্দিত হয় নদীমাতৃক বাংলাদেশের এক চিরকালীন রূপ, আর তা একই সাথে মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

প্রত্নরূপ/আর্কিটাইপ চিত্র সৃজন

তিতাস একটি নদীর নাম চলচ্চিত্রের মহাকাব্যিক গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো এর প্রত্নরূপ (archetype) নির্মাণের ভঙ্গি ও প্রবণতা। আর্কিটাইপ হলো জীবনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা প্রত্যেক মানুষের যৌথ অবচেতনে (collective unconscious) অবস্থান করে। প্রত্ন গুণ বিশিষ্ট একটি প্রতীক বা বস্তুকে যে কোনো দেশের বা সংস্কৃতির মানুষই পাঠ করতে পারে তাদের সংস্কৃতি বা সময়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও। আর্কিটাইপ-এর ধারণাটি নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা ও গবেষণাধর্মী লেখার সূচনা করেন সুইস মনোবিশ্লেষক কার্ল ইয়ং (Carl Jung), যদিও প্রত্নরূপ মানুষের ভেতর বিরাজমান ছিল অনেক আগে থেকেই। ইয়ং মনে করেন, উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ যেমন নানা আচরণ সহজাতভাবে পেয়ে থাকে, তেমনি প্রাপ্ত হয় বিভিন্ন আর্কিটাইপ বৈশিষ্ট্য ও চিত্রের ধারণা। আর এই আর্কিটাইপ চিত্রের প্রবণতাসমূহের মাঝে আছে বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য। ইয়ং এর ভাষায়:

> [T]his term is apposite and helpful, because it tells us that so far as the collective unconscious contents are concerned we are dealing with archaic or - I would say - primordial types, that is, with universal images that have existed since the remotest times (Jung, 1996: 4-5).

আর্কিটাইপ প্রবণতাসমূহ সাধারণত পৌরাণিক কাহিনি, আচার-অনুষ্ঠানে দৃশ্যমান হয়। আর এই রূপগুলো সাহিত্য, গল্প ও নাটকেও বিধৃত হয়। ঋত্বিকও এই চলচ্চিত্রে নানা আর্কিটাইপ ধারণার প্রয়োগ করেছেন "সমষ্টিগত অবচেতন"-এর প্রকাশে। এই সমষ্টিগত অবচেতনের ধারণা কখনও মালোদের গোষ্ঠী চেতনাকে ছাপিয়ে হয়ে উঠেছে বাঙালির সমষ্টিচেতনার পরিচয়বাহী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এ চলচ্চিত্রে মাতৃপ্রতীমার রূপ নির্মাণ প্রসঙ্গ। অনন্তের মায়ের মৃত্যুর পর, সে প্রায়ই তার মাকে দেখতে পায় নদী তীরে "মা ভগবতী"-র বেশে (চিত্র ৯)। উপন্যাসেও দেখি, অনন্ত মাকে স্বপ্নে দেখে মায়ের মৃত্যুর পর, তবে ভগবতীর বেশে নয়, তার মা সেখানে আসে খালের পাড়ে ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে। চলচ্চিত্রে মাকে দেবী ভগবতীর প্রত্নরূপে নির্মান করেছেন ঋত্বিক অনন্তের স্বপ্নে ও কল্পনায়। তার মায়ের ত্রিনয়না দেবীমূর্তীর সাথে চণ্ডীরও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মোদ্দা কথা, ভগবতী বা চণ্ডী মূল কথা নয়, এখানে অনন্ত মাকে দেখছে মাতৃপ্রতীমা বা "mother goddess" রূপে, সেটাই প্রধান বিবেচ্য। ঋত্বিক নিজেও এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন: "[I]n my films I think I am tremendously influenced by Jung's 'mother complex'.[...] In *Titas* a boy dreams of his mother as a 'mother goddess'. This mother-complex is a basic point (Rajadhyaksha and Gangar, 1970: 105)।" ইয়ং মাদার কমপ্লেক্স-এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে উল্লেখ আছে, মায়ের সাথে শিশুর অপরিহার্য সংযোগ আর সম্পর্কের কথা। মাতৃ জঠর হতে শিশুর জন্ম। একটি শিশুর বৃদ্ধিতে মায়ের স্নেহ, ভালোবাসা ও যত্ন পৃথিবীতে তাকে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। এ কারণে শিশু অনেক সময়ই মাকে দেবী/বৃহৎ/মহৎ রূপে কল্পনা করে। সুতরাং মানুষের জীবনে মাতৃত্বের এই অপরিহার্য ভূমিকার কারণে মাতৃত্বের যে আর্কিটাইপ চিত্র ও ধারণা আমাদের সমষ্টিগত অবচেতনে ক্রিয়া করে – তা সার্বজনীন। এই আর্কিটাইপকে কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশের অনুষঙ্গে আনেননি ঋত্বিক এই চলচ্চিত্রে। এখানে উল্লেখ্য, এই "মাদার-কমপ্লেক্স" কমবেশি স্বয়ং ঋত্বিকের মাঝেও ক্রিয়া করেছে। দেশ যদি হয় মাতৃস্বরূপা, তবে সেই মাতার সাথে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটেছে দেশভাগের ফলে। আর এ কারণেই তিনি প্রায় তাঁর সমস্ত ছবিতেই এই মাতৃরূপের মাহাত্ম্য রচনা করেছেন দেবীর আর্কিটাইপ ইমেজ নির্মাণের সমান্তরালে। *তিতাস*-এ এভাবে মায়ের প্রতীক হিসেবে "জগদ্ধাত্রী"-র আর্কিটাইপ রূপ নির্মাণের সমালোচনা করেছেন গৌতম ভদ্র। অবশ্য চলচ্চিত্রে জগদ্ধাত্রী নয় ভগবতীর প্রতীমা রূপে অনন্তের কল্পনায় দেখা দিয়েছে তার মা। গৌতম ভদ্রের মতে মালোরা বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী, তাদের আর্কিটাইপ চিত্র হবে মোহিনী রাধার (২০২০: ২৮৩)। তবে কী তিনি রাধার মূর্তিকেই প্রত্যাশা

করেছিলেন অনন্তের কল্পনায়? উল্লেখ্য, একটি সদ্য মাতৃহারা শিশুর মনোজগত আর আকাঙ্ক্ষাকেই কিন্তু ঋত্বিক এখানে মুখ্য করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল – শিশুটি মাকে দেবীরূপে কল্পনা করছে – তা দেখানো। দেবীকে নয়, বরং এখানে মাকে মাহাত্ম্য দেওয়া হয়েছে। এতে জোর পূর্বক আর্কিটাইপের প্রয়োগ হয়নি। ববং ভগবতীর পরিবর্তে রাধাকে দেখালেই তা আরোপিত মনে হতো।

চিত্র ৯. মায়ের মৃত্যুর পর অনন্তের কল্পনায় ভগবতীরূপী তার মা।[১১]

ঋত্বিক অবশ্য রাধা-কৃষ্ণের প্রসঙ্গ/আর্কিটাইপ এনেছেন এ চলচ্চিত্রে – যখন সে প্রসঙ্গ তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। উদারণস্বরূপ বলা যায়, নদীতে কিশোরকে রাজার ঝি-এর স্নান করানোর দৃশ্যে সেই আর্কিটাইপ চরিত্র দুটোর নির্মাণের ইঙ্গিত আমরা পাই। দূর থেকে ভেসে আসছিল রাধাকৃষ্ণের মিলনকে ঘিরে কীর্তনের কথা ও সুর। আর তার মাঝে কিশোর আর রাজার ঝি, দুজন দুজনকে আবির মাখিয়ে দেয় হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে। এ যেন নদী তীরে রাধাকৃষ্ণের মিলন।

এই চলচ্চিত্রের রামপ্রসাদ আর কাদের মিয়া – এই দুই চরিত্রের মাঝে আমরা লক্ষ্য করি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত প্রাচীন গল্পের জ্ঞানী বৃদ্ধের (wise old man) নানা আর্কিটাইপ বৈশিষ্ট্য। গ্রিস, রোম, রাশিয়া, জার্মানি, ও আফ্রিকাসহ অনেক দেশের প্রাচীন গল্পে আমরা দেখি এমন চরিত্রের উপস্থিতি। সে নায়ককে বুদ্ধি, সাহস দিয়ে সাহায্য করে। জীবনের নানা দিকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হাজির

---

১১. চিত্রটি প্রাপ্তির উৎস সাজেদুল আউয়াল সম্পাদিত *ঋত্বিকমঙ্গল*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ৪৯১।

করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক নাটকে সৃষ্ট "দাদা ঠাকুর" চরিত্রকেও আমরা এই "জ্ঞানী বৃদ্ধের" কাতারে ফেলতে পারি। *তিতাস*-এ রামপ্রসাদ ও কাদের মিয়া দুই ধর্মের লোক। কিন্তু তারা তাদের গোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্য কাজ করে – অন্যায়ের প্রতিবাদ করে – আবার কখনও কষ্টের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে জীবনের কোনো কোনো পর্যায়। একজন অর্থাৎ রামপ্রসাদ কখনও *রামায়ণ*-এ বাল্মিকীর অভিনয় করে, অন্যজন মানে কাদের মিয়া কারবালার বৃত্তান্ত শোনায়। এই দুই জনের নানা মিল দেখে বনমালিকে কাদের মিয়ার উদ্দেশ্যে বলতে শুনি: "তোমারে দেখলে না – আমার যাত্রার বাড়ির রামপ্রসাদ কাকার কথা মনে পড়ে। হেয় রামায়ণের বাল্মিকী করে" (ঘটক, ১৯৭৩)। এই মিলের কারণেই হয়ত এই দুটি চরিত্রের অভিনয় ঋত্বিক করিয়ে নেন একজন অভিনেতা, গোলাম মুস্তাফাকে দিয়ে। এ বিষয়ে ঋত্বিকের ব্যাখ্যা: "সাফারিং ও উইজডমে মানুষ এক হয়ে যায়" (কায়সার,২০০১: ২১০)। অতএব ধর্মীয় পরিচয় নয়, বরং শ্রেণি অবস্থান, সংগ্রাম, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আর দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে রামপ্রসাদ ও কাদের মিয়া নিপীড়িত মানুষের "জ্ঞানী বৃদ্ধ"-এর চিরকালীন প্রত্নরূপ নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। আর এই চিরকালীন রূপের মাঝে প্রাচ্যের মহাকাব্য উদ্ভূত চরিত্রদের প্রণোদনাও স্পন্দিত হয়।

বিভিন্ন পর্বের অবস্থান্তর (transition) ও আবেগ সৃষ্টি

তিতাস-এর ঘটনাক্রমকে ঋত্বিক যে ভাবে বিন্যস্ত করেছেন, তাতে আছে এপিসোডিক বিস্তার। মূল উপন্যাস রচনায়ও এই পর্ব বিভাজন দৃশ্যমান। তবে চলচ্চিত্রে, এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে প্রবেশের অবস্থান্তর বা transition দেখাতে ঋত্বিক ব্যবহার করেছেন তিতাসের নানা দৃশ্য। ফলে ঘটনা ও সময়ের অগ্রসরতা চিত্রিত হয়েছে নদীর প্রবহমানতার চিত্রকল্প সৃজনের মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, কিশোরী বাসন্তী ও রামপ্রসাদ কাকার নদী তীরে আলাপের পর সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। আর সেই পরিবর্তনের মধ্যবর্তী অংশে ঋত্বিক দেখিয়েছেন তিতাস-এর নানা আঙ্গিকের শট (চিত্র ৪), বাঁশির সুরের আবহে। আবার রাজার ঝি যখন ডাকাতের হাত হতে বাঁচার জন্য নদীতে ঝাঁপ দেয়, ভাসতে ভাসতে নদীর পাড়ে এসে ঠেকে অজ্ঞান অবস্থায় এবং দুই বৃদ্ধের মাধ্যমে উদ্ধার পায়, তারপরে সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে। এখানেও এই পরিবর্তন সৃষ্টির পূর্বে, সময়ের অবস্থান্তরকে ঋত্বিক চিত্রিত করেন নদীর নানা দৃশ্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে। আর সে সকল দৃশ্যের আবহে বেজে উঠেছে বাঁশি ও একতারার মিলিত সুর। ঘটনার অগ্রসরতায় *তিতাস*-এর শেষ দিকে আমরা দেখির নদীটির ক্রমশ মৃত্যু। তখনও তিতাস এসেছে তার শীর্ণ রূপসহ ঘটনাপর্বের ট্রানজিশন হয়ে। যেমন, তিতাস যখন প্রায় শুষ্ক, তখন বাসন্তী আর উদয়তারার সাক্ষাৎ হয়। বাসন্তীর সংলাপের বিপরীতে ভেসে উঠে শীর্ণ তিতাসের শট, যা আমরা দেখি চলচ্চিত্রের টাইটেল দৃশ্যের আগে (চিত্র ৫)। এও কী চলচ্চিত্রের পরিণতি নির্দেশক অবস্থান্তর নয়? শেষ দৃশ্যে, যখন ধু ধু চর ধরে হাঁটে বাসন্তী পানির খোঁজে – সে চরও তিতাসের আর এক রূপ। এভাবে তিতাস এসেছে সময় পরিবর্তনের অনুষঙ্গে ঋত্বিকের মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণ ভঙ্গিতে।

শুধু অবস্থান্তর সৃষ্টির অনুষঙ্গেই নয়, তিতাস এসেছে ঘটনার আবেগ নির্মাণের সূত্রে। রাজার ঝি-র মৃত্যুর পর অনন্ত যখন বাসন্তীর উদ্দেশ্যে 'মাসী' বলে চিৎকার করে ওঠে, তখন বাসন্তীর অশ্রুসিক্ত-বেদনাকাতর মুখের ক্লোজ শটের[১২] পরই আমরা দেখি বর্ষা সিক্ত তিতাসের নানা মাত্রিক শট। বৃষ্টির অঝোর ধারায় তিতাসও যেন কেঁদে চলেছে এই মৃত্যু বেদনায়।

---

১২. ক্লোজ শট: স্বল্প পরিধির শট যেখানে ব্যক্তি বা বস্তুকে কাছাকাছি থেকে দেখার অনুভূতি জাগে। এতে পটভূমি বিধৃত হয় খুব অল্প পরিমাণে।

আরও একটি দৃশ্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ্য। অনন্ত যখন বাসন্তীকে ছেড়ে উদয়তারার সাথে চলে যায় তার বাবার বাড়িতে, সেই মুহূর্তে বাসন্তীর মাতৃত্বের ব্যাথা চিত্রায়ণে তিতাসও যেন হয়ে ওঠে একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। তবে দৃশ্যটির আবেগ নির্মাণে পরিবেশ-সৃষ্ট শব্দ, ও আবহ সংগীতে লোকজ গানের ভূমিকাও উল্লেখ করার মতো। নৌকায় ছইয়ের ওপর হেলান দিয়ে পাটাতনের উপর বসা উদয়তারা পা দুটোকে পানিতে ভিজিয়ে নাচাচ্ছে। ওর ঘাড়ে হেলান দিয়ে আছে অনন্ত। ওরা প্রতীক্ষা করছে বনমালীর জন্য। বনমালী এলেই নৌকা ছাড়া হবে। এর মাঝে উদয়তারা ছড়া কাটে:

যাই যাই যাই,
নয়া গাঙে যাই,
মন কেমুন কেমুন করে, তাই
চল, জলে ভাইসা যাই।
কারণ ভাবনা কিছুই নাই [...] (ঘটক, ১৯৭৩)।

উদয়তারার সংলাপ চলতে চলতেই বাসন্তী ঘাটে এসে দাঁড়ায় মুংলীসহ। ঘাটে রাখা কাঠের গুঁড়িতে কেউ একজন কাপড় আছড়াচ্ছে। কাপড় আছড়ে পড়ার ক্লোজ শট থেকে ক্যামেরা প্যান[১৩] করে বাসন্তীর পায়ে এসে পড়ে। তারপর টিল্ট আপ[১৪] করে বাসন্তীর মুখের ক্লোজ শট ধরে ক্যামেরা। বাসন্তী করুণ চোখে দেখে উদয়তারা ও অনন্তকে। এর আবহে আমরা শুনতে পাই ঢেউয়ের হালকা শব্দ আর সেই কাপড় আছড়াবার তীব্র শব্দ। এই শব্দ যেন বাসন্তীর হৃদয়ে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত সৃষ্ট শব্দের অনুবাদ। অনন্ত চলে যায় ছই-এর ভেতর। এর কিছুক্ষণ পরে, বনমালী এসে নৌকা ঠেলে নিয়ে যায় নদীর বুকে। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসন্তী বেদনা ভরে দেখে ওদের চলে যাওয়া। মুংলী এসে হাত রাখে বাসন্তীর কাঁধে। চলে যাওয়া নৌকাটির দিকে তাকিয়ে একসময় ক্রোধে সে বলে ওঠে: "কুইত্তা"। আবহ সংগীতে ভেসে ওঠে লোকজ গান:

ও তোর আপন দোষে সব হারালি
এই দোষ তুই দিবি কার
পোড়ামুখি কান্দিস না লো আর [...] (ঘটক, ১৯৭৩)।

এর মাঝে মুংলী চলে যায়। এই গান চলতে চলতে বাসন্তীকে দেখি আমরা প্রোফাইল শটে। বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম। তার পেছনে বৃষ্টিসিক্ত তিতাস – আউট অব ফোকাস – একটা নৌকা চলে যায় (চিত্র ৭)। তিতাসও যেন বাসন্তীর বেদনায় ক্রন্দনরতা। বাসন্তী ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে ক্যামেরা দ্রুত প্যান করে এসে স্থির হয় দু-তিনটি শূন্য নৌকার ওপর। অঝোর বৃষ্টিতে নৌকা তিনটির হালকা দুলুনির মাঝেও যেন বাসন্তীর হৃদয় বেদনা অনুদিত হয়। এভাবে শব্দ, গান, বস্তু, অভিনেত্রীর অভিব্যক্তি আর প্রকৃতি – এদের সকলের শৈল্পিক সমবায়ে ঋত্বিক যেভাবে বাসন্তীর মাতৃহৃদয়ের কষ্টকে মূর্ত করেন, তা বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক অনন্য চলচ্চিত্রিক করণ কৌশল এবং তা একই সাথে এক মহাকাব্যিক মুহূর্ত।

দৌড়ের নাও-এর দৃশ্যটিও আর একটি মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র ভঙ্গির অনন্য উদাহরণ। তিতাসের বুকে নৌকা বাইচের আয়োজন উপলক্ষে সমবেত হয়েছে অনেক দৌড়ের নাও। নদীর পাড়ে এসে ভীড়ে ছোট-বড় আকারের অসংখ্য পালের নৌকা, বাড়ির বৌ-ঝিদের নিয়ে। নদীর কিনারে হাজারো মানুষ সমবেত হয়েছে নাও দৌড়ানি দেখতে। ঢাক-ঢোল আর কাঁসর বেজে চলেছে। কেউ কেউ গান

---

১৩. আড়াআড়ি করে বা আনুভূমিকভাবে ক্যামেরা চালনার মাধ্যমে শট ধারণ।

১৪. নীচ থেকে উপরের দিকে ক্যামেরা চালনা করে শট ধারণ।

ধরেছে। কোনো কোনো নৌকায় দেখা যায় – নানা নকশা আঁকা। মাঝিদের দল সমবেত ভাবে দৌড়ের নাওয়ের বৈঠা ঘুরাচ্ছে নানা কায়দায়, গানের ছন্দের সাথে মিল করে। মূল নৌকা বাইচ তখনও শুরু হয়নি। এ দৃশ্যগুলো মূলত বাইচের পূর্ব মুহূর্তের প্রস্তুতিকে নিয়ে। এরই মাঝে অনন্ত ও তার মাসী, বাসন্তীর দেখা হয়। মাসী অনন্তকে জড়িয়ে ধরে। উদয়তারার ব্যঙ্গাত্মক কথায় অনন্ত মাসীকে বলে তাকে ছেড়ে দিতে। সে বলে, তার মা নাই, তাই মাসীর আদরও নাই। বাসন্তী রাগে-দুঃখে বলে উঠে:

> **বাসন্তী:** ওরে বেইমান কাউয়া, এই হগল কথা তোরে কে হিগাইল, কোন বান্দিনীর ঝিয়ে হিগাইল?
>
> **উদয়তারা:** আ লা বান্দিনীর ঘরের চান্দিনী। মুখ সামলাইয়া কথা ক, বুক সামলাইয়া বাড়ি যা, বেশি কথা তুলিস না, ছালার মুখ খুলিস না (ঘটক, ১৯৭৩)।

এর পরেই দেখি, বাসন্তী অপমানে, রাগে ক্রুদ্ধ হয়ে অনন্তকে "কাউয়ার বাচ্চা" বলে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চড় লাগাতে থাকে। বনমালী এগিয়ে আসে ওদের দিকে। উদয়তারাও এগিয়ে এসে বাসন্তির চুলের মুঠি ধরে। তারপরেই কাট করে এসে বাইচের নাওগুলোর ক্ষিপ্র গতির শটের সংযোজন। বাড়তে থাকে কাঁসর, ঢাকের বাদন। শুরু হয় নাও দৌড়ানি। তিতাসের বুকে বাইচের নাওয়ের মাঝিরা উন্মত্ততালে বৈঠা ফেলে তীব্র উদ্দামে ছুটে চলছে। আর এই উন্মত্ততার দৃশ্যায়নের মধ্য দিয়ে ঋত্বিক আমাদের অনুভূতিতে তুলে আনেন উদয়তারা আর তার দল কর্তৃক বাসন্তীর প্রহৃত হওয়ার ঘটনা। একটি ঘটনার প্রকৃত দৃশ্যায়ন না ঘটিয়েও অন্য একটি চিত্রদৃশ্যের মধ্য দিয়ে মূল ঘটনার অভিঘাত সৃষ্টির এই মুনশিয়ানাকে আমরা কোনো বিদেশি চলচ্চিত্রের করণ কৌশলের সাথে তুলনা করতে অক্ষম। এ ঋত্বিকের একান্ত নিজস্ব চলচ্চিত্র ভাষা।

ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের শিল্পভাষাকে অনুধাবনের জন্য শুধুমাত্র চিত্রগ্রহণ বা সম্পাদনার কৌশল কিংবা চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুষঙ্গগুলোর ওপর একক ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, তা অনুমেয় হবে না। শব্দ, শব্দহীনতা, সংগীত, অভিনয়, সংলাপ, প্রেক্ষাপট, দৃশ্য উপকরণ, আলো, শটের আকৃতি, পরিপ্রেক্ষিত, দৃশ্য বিন্যাস, দৃশ্য পরিবর্তনের গতি – সবকিছু মিলিয়ে তৈরি হয় তার দৃশ্যনির্মাণের অভিঘাত ও আবেগ। আর এই অভিঘাত ও আবেগের টুকরো টুকরো গ্রন্থনে নির্মিত হয় *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রের অখণ্ড অবয়ব।

উপসংহার

চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে ঋত্বিক বেছে নিয়েছিলেন গল্প বলার এক মাধ্যম হিসেবে। তাঁর মতে: "আমার কথা আছে, বক্তব্য রয়েছে, আমাকে তা বলতে হবে। চলচ্চিত্র হলো মিডিয়াম অব এক্সপ্রেশন" (মুৎসুদ্দী, ২০০১ক: ২৭)। নিজের বক্তব্য বা গল্পকে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি এই মাধ্যমকে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর মতো করে, নিজস্ব ঢঙে। একে অনেকেই ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর "স্বতন্ত্র চলচ্চিত্র-রীতি" হিসেবে (রায়, রজত, ২০২০: ১৪)। তাঁর লক্ষ্য ছিল জাতীয় চলচ্চিত্র রীতির প্রতিষ্ঠা। এ কারণেই সত্যজিৎ রায়কে বলতে শুনি: "আমরা যারা প্রায় গত চল্লিশ বছর ধরে ছবি দেখেছি, [...] আমরা হলিউডের বাইরে খুব বেশি ছবি দেখতে পারিনি। আমাদের সকলের মধ্যে তাই কিছু কিছু হলিউডের প্রভাব ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ঋত্বিক এক রহস্যময় কারণে সম্পূর্ণ সে-প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল; তাঁর মধ্যে হলিউডের কোনো ছাপ নেই" (২৯)। ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে হলিউডের ছাপ না থাকলেও চলচ্চিত্রে তিনি এসেছেন আইজেস্টাইনের বই পড়ে – এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে তাঁর সাক্ষাৎকারে। একজন বামপন্থি চিন্তাধারায় উজ্জীবিত চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিকের অন্যান্য চলচ্চিত্রের মতো *তিতাস*-এও আছে দ্বান্দিকতা সৃষ্টির নানা মুহূর্ত। কিন্তু এ চলচ্চিত্রে ঋত্বিক যেন শেকড়ের প্রতি দায়বদ্ধতায় বাঙালির আবহমান কালের শিল্পভঙ্গিকে খুঁজে আনেন। দর্শকের সামনে উপস্থাপন করেন বাঙালির

স্বতন্ত্র চলচ্চিত্র আঙ্গিকের এক নীরিক্ষামূলক অবয়ব। এ কারণেই এতে দ্বান্দিকতা সৃষ্টির পাশাপাশি বাস্তবতা ও প্রামাণ্যধর্মীতা যেমন আছে, তেমনি আছে ঐতিহ্যের প্রকাশে নানা চিরকালীন অনুষঙ্গ ও চলচ্চিত্রিক কৌশল। বাস্তব আয়তন ও প্রকৃত আলোক উৎসের ব্যবহার, লোকজ গান ও সুরের ব্যবহারে আবেগ নির্মাণ, প্রত্নরূপের সংশ্লেষ, চরিত্র ও বিষয়কে প্রেক্ষাপটে স্থাপনের উদ্দেশ্যে লঙ শটের ব্যবহার, কখনও নাটকীয় ক্লোজ শট ও ক্যামেরার দ্রুত চলনে দৃশ্যের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ, অসাম্প্রদায়িক লোকজ জীবন ও আর্কিটাইপ প্রবণতার প্রকাশে একই অভিনেতা দিয়ে দুই ভিন্ন ধর্মের চরিত্রের চরিত্রায়ণ, শব্দ ও সংলাপে একই সাথে কাহিনির ভাব প্রকাশ ও দৃশ্য-উর্ধ্ব দূরাগত অর্থের নির্দেশ, দৃশ্য উপকরণ ও পোশাকে একই সাথে বাস্তবতা ও চিরকালীন রূপ নির্মাণ, ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্য *তিতাস*-কে দিয়েছে বাঙালির নিজস্ব শিল্পভঙ্গিজাত এক মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রের মহিমা। রৌদ্র-ঝড়, অভাব-দারিদ্র্য, দ্বন্দ্ব-কলহ, লোকাচার, পূজা-পার্বন, আনন্দ-বেদনা, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু সমেত মালো সম্প্রদায়ের জীবনপ্রবাহকে ঋত্বিক তুলে আনেন এ চলচ্চিত্রে নদীর ভাঙ্গা-গড়ার সমান্তরালে – বাংলাদেশের লৌকিক জীবনের প্রতিনিধি করে। আবার এই লৌকিক জীবনকেই তিনি যেন এক চিরকালীন মহিমা দিয়েছিলেন তাঁর মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণভঙ্গিতে।

সহায়ক তথ্যসূত্র (বাংলা তথ্যপঞ্জি)

আউয়াল, সাজেদুল (সম্পাদিত) । ২০০১। *ঋত্বিকমঙ্গল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

আউয়াল, সাজেদুল। ২০১০। "ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে সমাজবাস্তবতার রূপায়ণ"। *চলচ্চিত্রকলা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

কায়সার, শান্তনু। ২০০১। "'তিতাস'-এর চলচ্চিত্রায়ণ", সাজেদুল আউয়াল সম্পাদিত *ঋত্বিকমঙ্গল*-এ সংকলিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

খসরু, মুহম্মদ। ২০০১। "শেষ সাক্ষাৎকার: প্রথম নমস্কারের আগে"। সাজেদুল আউয়াল সম্পাদিত *ঋত্বিকমঙ্গল*-এ সংকলিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

খালেদ হায়দার ও বাকির আবদুল্লাহ। ২০০১। "তিতাসের প্রযোজকের সাথে কিছুক্ষণ"। সাজেদুল আউয়াল সম্পাদিত, *ঋত্বিকমঙ্গল*-এ সংকলিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

ঘটক, ঋত্বিক কুমার (সংগীত ভাবনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা)। ১৯৭৩। *তিতাস একটি নদীর নাম*, বাংলাদেশ: পূর্বপ্রাণ কথাচিত্র [চলচ্চিত্র]।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ । ২০১২। "ভূমিকা ও নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস"। গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোধ্যায় সম্পাদিত, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

*চিত্রালী*র প্রতিনিধি সাংবাদিকের সাথে ঋত্বিকের সাক্ষাৎকার। ১৯৭৩, এপ্রিল। "আমি নতি স্বীকার করিনা"। সাজেদুল আউয়াল সম্পাদিত (২০০১) *ঋত্বিকমঙ্গল*-এ সংকলিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। পৃ. ৩১- ৩৫।

চিত্রালী রিপোর্ট। ১৯৭৩। আগস্ট। "ঋত্বিক ঘটক বলেন: আমি ছাড়া তিতাস হতো না"। সাজেদুল আউয়াল সম্পাদিত (২০০১) *ঋত্বিকমঙ্গল*-এ সংকলিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। পৃ. ১০৫।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ১৪০২ বঙ্গাব্দ। "প্রাচীন সাহিত্য", *রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড*। কলিকাতা: বিশ্বভারতী।

দাশ, শ্রীশচন্দ্র। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ। *সাহিত্য-সন্দর্শন*। কলিকাতা: বামা পুস্তকালয়।

বসুরায়, ইরাবান । ২০২০। "জীবন, চলচ্চিত্র, রাজনীতি এবং ঋত্বিক কুমার ঘটক"। রজত রায় সম্পাদিত *ঋত্বিক ঘটক*-এ সংকলিত, কলকাতা: প্রতিভাস।

ভদ্র, গৌতম। ২০২০। "তিতাস একটি নদীর নাম: মালোর চোখে, তিতাস একটি নদীর নাম : মধ্যবিত্তের চোখে"। রজত রায়, সম্পাদিত *ঋত্বিক ঘটক*-এ সংকলিত, কলকাতা: প্রতিভাস।

মল্লবর্মণ, অদ্বৈত। ২০১৬ [মূল উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬ সাল]। *তিতাস একটি নদীর নাম*। ভূমিকা রচনা ড. হরিশংকর, জলদাস, ঢাকা: উৎস প্রকাশন।

মুৎসুদ্দী, চিন্ময়। ২০০১ক। "আমি বেঁচে আছি"। সাজেদুল আউয়াল সম্পাদিত *ঋত্বিকমঙ্গল*-এ সংকলিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৭-৩০।

মুৎসুদ্দী, চিন্ময়। ২০০১খ। "তিতাস একটি নদীর নাম: অসার্থক চিত্ররূপ"। সাজেদুল আউয়াল সম্পাদিত *ঋত্বিকমঙ্গল*-এ সংকলিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৫১।

রায়, রজত (সম্পাদিত)। ২০২০। *ঋত্বিক ঘটক*। কলকাতা: প্রতিভাস।

রায়, সত্যজিৎ। ২০২০। "ঋত্বিক ঘটক"। রজত রায় সম্পাদিত *ঋত্বিক ঘটক*-এ সংকলিত। কলকাতা: প্রতিভাস।

রাশেদ, পার্থিব ও রফিক, মনিস (সম্পাদিত)। ২০২০। *ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম: চিত্রনাট্য*। ঢাকা: রোদেলা।

হায়দার, খালেদ ও আবদুল্লাহ, বাকির। ২০০১। "তিতাসের প্রযোজকের সাথে কিছুক্ষণ"। সাজেদুল আউয়াল সম্পাদিত, *ঋত্বিকমঙ্গল*-এ সংকলিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

English References

Aristotle. 2000. *Poetics.* A Translation by S. H. Butcher. A Penn State Electronic Classics Series Publication.

British Film Institute's Web page:

http://www.bfi.org.uk/features/imagineasia/guide/poll/bangladesh/ (accessed on 11 November, 2010).

Ghatak, Ritwik. 1987. *Cinema and I.* Calcutta: Ritwik Memorial Trust.

Gomery, Douglas and Pafort-Overduin. Clara. 2011. *Movie history.* Abingdon: Routledge.

Hayward. Susan. 2005. *Cinema Studies: The Key Concepts* (2nd ed). Oxon: Routledge.

Johns-Putra, Adeline. 2006. *The History of the Epic.* Hampshire and New York: Palgrave Macmillan.

Jung, C. G. 1996. *The Archetypes and the Collective Unconscious.* Translated by R. F. C. Hull, London: Routledge.

Kabir, Alamgir. 2001. "Bad Name: Titas Ekti Nadir Nam". In *Ritwikmongal*, edited by Sajedul Awwal. Dhaka: Bangla Academy.

Morning News. 1973. "Information Minister Inaugurates 'Titas Ekti Nadir Nam.' " 27 July.

Quinn, Edward. 2006. *A Dictionary of Literary and Thematic Terms, Second Edition.* New York : Facts On File.

Rajadhyaksha, Ashish and Gangar, Amrit (eds.). 1970. *Arguments/Stories.* Bombay: Screen Unit, Research Centre For Cinema Studies.

Rajadhyaksha, Ashish and Willemen, Paul. 1998. *Encyclopaedia of Indian Cinema*. New Delhi: BFI Publishing and Oxford University Press.

The Case for Global Film, "Titas Ekti Nadir Naam (A River Called Titas)" (written anonymously) https://itpworld.wordpress.com/2010/08/09/titas-ekti-nadir-naam-a-river-called-titas/ (accessed on 1, June, 2022).

পরিশিষ্ট – ১

তিতাস একটি নদীর নাম চলচ্চিত্রের কুশলী লিপি (নির্বাচিত)

কাহিনিঃ অদ্বৈত মল্লবর্মণ

সংগীত ভাবনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটক

প্রযোজনাঃ পূর্বপ্রাণ কথাচিত্র-র পক্ষে এন এম চৌধুরী বাচ্চু, হাবিবুর রহমান খান, ফয়েজ আহমেদ

মূল গায়কঃ ধীরাজ উদ্দীন ফকির

সংগ্রহ সংগীত সরবরাহঃ হরলাল রায়

নেপথ্য গানে কণ্ঠঃ রথীন্দ্রনাথ রায়, নীনা হামিদ, আবেদা সুলতানা, ধর্মীদান বড়ুয়া, দীপু মমতাজ, পীলু মমতাজ, আবু তাহের, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী

সহযোগী পরিচালনাঃ আব্দুল জলি মিন্টু, তমিজউদ্দীন রিজভী, আমজাদ হোসেন

সহযোগী চিত্রগ্রাহকঃ মুর্শেদ আহমদ

সহযোগী সম্পাদকঃ আতিকুর রহমান, আনোয়ার হোসেন, খুরশেদ আলম

শব্দ গ্রহণঃ আমজাদ হুসাইন

শব্দ পুনঃ সংযোজনঃ হারুন-অর-রশীদ

রূপসজ্জায়ঃ রেবতী দাস, মহম্মদ শাহজাহান

সংলাপঃ সৈয়দ নুরুল ইসলাম

শিল্প নির্দেশনাঃ মুনশী মহিউদ্দীন

সম্পাদনা (সহকারী)ঃ আবু তালেব, মাহবুবুর রহমান

প্রধান সহকারী পরিচালকঃ ফখরুল হাসান বৈরাগী

প্রধান সহকারী চিত্রগ্রহণেঃ বুলবুল ওয়াজেদ

সংগীতঃ ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান

সম্পাদনাঃ বশীর হোসেন

চিত্রগ্রহণঃ বেবী ইসলাম

কার্যনির্বাহী প্রযোজকঃ সানওয়ার মুর্শেদ

পরিস্ফুটনঃ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা

অভিনয়েঃ নূপুর, রওশন জামিল, শিরিন, গোলাম মুস্তাফা, প্রবীর মিত্র, ঋত্বিক কুমার ঘটক, চাণু ভট্টাচার্য, নারায়ণ চক্রবর্তী, আবুল খায়ের, মালতি দেবী, কবরী, রোজী সামাদ, রাণী সরকার, শফিক ইসলাম, অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শীলাজ মল্লিক, সুপ্রিয়া গুপ্তা, রহিমা খাতুন, সুফিয়া রোস্তম, ফরিদ আলি, মহিববুর রহমনা, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, খলিল খান, ফারুক খান, ফখরুল হাসান বৈরাগী, আবুল হায়াত, সিরাজুল ইসলাম, ও প্রমুখ।

[**Abstract**: In Ritwik Kumar Ghatak's film *Titash Ekti Nadir Naam* (A River Called Titas, 1973), we witness the epic construction of the reality of the lives of Malo, the fishing community living near the banks of the river, Titas. Even after almost fifty years of its production period, the film is still capable of creating an eternal appeal of classical cinema in the mind of the audience - across and beyond the country. An epic usually has a heroic character at its centre. However, *Titash Ekti Nadir Naam* does not contain any famous characters based on mythology or history. Here, both the disintegration and creation of the collective life of the lower class Malos has progressed parallel to the flow of the river, Titas. The pleasures and pains of the Malos; their festivals, rituals, birth and death, struggle for survival, unity, disruption in unity, defeat, the beginning of a new life again in the midst of decay - various issues like these have been captured in this film. All these themes based on a subaltern and folk-based lives of Malos have been immortalized as the elements of an epic in the film *Titash Ekti Nadir Naam* thanks to Ritwik's cinematic originality. This originality emerged from the traditional Bengali cultural consciousness. The main purpose of this paper is to explore the epic construction of this film. At the same time, this article scrutinizes how the lives of the lower class Malos achieve the epic glory in this film by denying the conventional definition and concept of the epic. Overall, this essay attempts to explore and understand the identical features and trends of epic film devised both in the subject matters and production techniques of *Titash Ekti Nadir Naam*.]